দিব্যেন্দু পালিত

সন্ধিক্ষণ

জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

১৪ই আগষ্ট, ১৯৬৫

প্রকাশক
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

গ্রন্থিক
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

সন্তোষকুমার ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

বিনিদ্র
উড়োচিঠি
প্রণয়চিহ্ন
মধ্যরাত
ভেবেছিলাম
সেদিন চৈত্রমাস
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি
রাজার বাড়ি অনেক দূরে

সন্ধিক্ষণ

১

ভোরের দিকে চলে গেল কনক। কাকপক্ষী জেগে ওঠার আগে, উদাসীন হাওয়া আর রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যে, এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমে ঢলে পড়ার মতো---নিঃশব্দে চলে গেল। নৈঃশব্দ্যই তখন একমাত্র ভূমিকা। তারায় ফুটফুটে আকাশ, নিচে ঘুম ; শুধু হাসপাতালের কেবিনের বাইরে ওরা তখনো কোনক্রমে জেগে চলেছে।

রক্তের মধ্যে ছোট ছোট লাল বীজগুলো ক্রমশ সাদা হবার মুখেই বলে দিয়েছিল ডাক্তার, অসম্ভব। বাঁচবে না। রোগটা খারাপই বলতে হবে—লিউকোমিয়া, দৈবও যাকে ক্ষমা করে না। আর কনক! সাধারণ, অতি সাধারণ কনক ; দূরত্বময় প্রহেলিকা ছাড়া দৈব তাকে আর কি দেবে!

তবু, টীম নির্ঘাত হেরে যাবে জেনেও এক সময় যেমন ওরা গড়িমসি করে মাঠে যেত, রোদ-ঝড় উপেক্ষা করে দাঁড়াত টিকিটের লাইনে, হারতে হারতেও শেষ পর্যন্ত গ্যালারি ছেড়ে নড়তে পারত না—তেমনি, ক্ষয়ে ক্ষয়েও আশাটা জাগিয়ে রেখেছিল বুকের মধ্যে। সামনাসামনি কনককে বলত, 'বাগাপ্'। বল পায়ে যদিও বড় দুরূহ কোণে চলে গিয়েছিল কনক।

প্রখর বুদ্ধিমান ছেলে কনক। সে কি জানত না মরে যাবে!

নিশ্চয় জানত।

জানত ওর বাবা মা ভাই বোনেরাও। জানত পৃথিবীসুদ্ধ লোকে।

চেনাশোনার মধ্যে থেকে হুট্ করে চলে যাবে একজন, চারিদিকের এই রটনা বহুদিন অপূর্ণ ঝুলে ছিল শুধু দিনক্ষণটির অভাবে!

দিনক্ষণটি না জানার জন্যই গাঁইগুঁই করতে করতেও লোভীর মতো একদিন কনক চলে আসে হাসপাতালের দামী কেবিনে। ঘাড় থেকে প্যারালিটিক হাতের মতো ঝুলছে দুই আইবুড়ো মেয়ে, তবু, দিনক্ষণটি না জানার জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের শেষ ছায়াটুকু গুটিয়ে নেয় কনকের বাবা; মা যায় প্রত্যহ কালীঘাটে। দিনক্ষণটি না জানার জন্য একই রক্ত বিভিন্ন বোতলে গিয়ে গ্রুপ পালটায়। রোজ। এইভাবে, একই নিয়মে, দিনক্ষণটির অভাব কিছু ভরসা রেখে দিয়েছিল বুকের মধ্যে। অথচ কনক মারা গেল নির্দিষ্ট সময়টুকু অঘোষিত রেখে।

কেবিনের ভিতর তখন অস্পষ্ট মিহি আলো। কেবিনের বাইরে বারান্দায় বসে নিভন্ত সিগারেট চুষছে অমিয়। নিখিলের কোলে মাথা রেখে, চোখে হাত চাপা দিয়ে মৃত্যুর, যে-কোন মৃত্যুর, কারণ সম্পর্কে ভাবছে শ্যামল, নিখিল কি বলছে শুনছে না। নিখিল অমিয়কে বলছে, 'বড় কাহিল লাগে রে। কাল থেকে ফ্লাস্কে চা আনব—'

'রাত জাগার জন্যে চা! ক'টা ফ্লাস্ক লাগবে হিসেব করেছিস?' অমিয় হাত ঢোকালো শ্যামলের ট্রাউজার্সের পকেটে; ফুসফুসে অনেক ধোঁয়া জমে ওঠার পরও মনে হচ্ছে আরো চাই; শ্যামল ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'দাঁড়া দিচ্ছি।'

'চায়ে কিস্সু হয় না।' দেশলাইয়ের আলোয় অমিয়র মুখটা এক মুহূর্ত ঝলসানো মনে হল, বলল, 'জেগে থাকার ইচ্ছেটাই ঘুমোতে দিচ্ছে না—'

জমল না। কিছুদিন থেকেই এই ব্যাপারটা মনে হচ্ছে, জমছে না কিছু। কথা, কথার পর কথা, আবার কথা।

শ্যামল বলল, 'জেগে থাকা কাকে বলে বুঝেছি তোর বিয়ের রাতে। তুমি তো বউ নিয়ে শুলে। বৃষ্টি পড়ছিল, আমরা আঁটকে পড়লাম। রিয়েল টর্চার! কনু সারা রাত তোদের খিস্তি করেই কাটিয়ে দিলে—'

হাঃ হাঃ হাঃ, অমিয়র গলার ভিতর ড্রাই হুইলের মতো হাসিটা চক্কর দিয়ে নিল; চেষ্টা করেও শব্দময় হতে পারল না। নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকার অতর্কিতে ওকে থামিয়ে দিল। মনে পড়ল এটা হাসপাতাল, প্রায় নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে মৃত্যুকে পাহারা দিচ্ছে ওরা; ঘুমোচ্ছে কনক।

'জেগে থাকার অভ্যাসটা সবচেয়ে বেশি ছিল কনকের।' নিখিল বলল, 'হোল নাইট শো থেকে মিউজিক কনফারেন্স কিছুই বাদ দিত না। ব্যাটা অফিসে শুনেছি দুটো থেকে সাড়ে তিনটে ঘুমিয়ে নিত ক্যান্টিনে বসে। নাম্বার ওয়ান ম্যানেজার, টিফিন পিরিয়ডটা বাড়িয়ে আড়াই ঘণ্টা করে নিয়েছিল—'

'আজ ওর মুখ দেখে কি মনে হচ্ছিল জানিস?'

'কি?'

'ও বেঁচে যাবে—'

'আয়ুটাকেও যদি ওমনি বাড়িয়ে নিতে পারত!'

অমিয় কাশতে নিখিল বলল, 'একটু কম খা। ধোঁয়া গিলে একদিন তুইও—'

জমল না। নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেল, হঠাৎ যেমন পড়ে যায়। ছেঁদো সব কথাবার্তা! জমছে না কিছু।

শেষবার কেবিনে ঢুকে কনককে দেখে এসেছিল রাত দুটোয়। জেগে থাকার অভ্যাস সত্ত্বেও ও তখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে, বুদ্ধের মতো চোখের পাতা নামিয়ে। অমিয়র মনে হয়েছিল বেঁচে যাবে—দামী কেবিনের পরিতৃপ্তি আর হাভাতে বাপের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা

বৃথা যাবে না। মাথার বালিশটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে দু'বার ওর নাম ধরে ডেকেছিল নিখিল, কনক, কনক। খুব চাপা, মৃদু গলায় বলেছিল, আমরা আছি রে—। মনে মনেই এইসব কথা বলা হয়। শ্যামল কিছু বলে নি বা ভাবে নি, বা ভাবলেও কনককে উপলক্ষ করে নয়।

কেবিন থেকে বেরুবার সময় তবু একটু খটকা লেগেছিল ওদের. ঠিক বাঁচবে তো!

মৃত্যুর জন্য আপনা-আপনিই কিছু আবহাওয়া ও পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়—যেমন এই কেবিন, মিহি আলোর চুপচাপ, ওষুধের মোলায়েম গন্ধে মনে-পড়া হাসপাতাল—নিপুণ দর্জির হাতে তৈরী মৃত্যুর পোষাকটা ঠিক ঠিক ফিট করবে কনকের গায়ে। বরং ভালো হত যদি ও থাকত এঁদো গন্ধের ভিতর, বাড়িতে, জ্বর গায়ে হঠাৎ-হঠাৎ উঠে বসত বিছানায়। বলত, 'তিরিশ বছরও বয়স হল না, এর মধ্যেই মরে যাবো! ভাবলেই শালা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি! আর কিছু না, একটা মেয়ের ভালোবাসাটাসাও পেলুম না, পুজোয় বোনাস পেলে কাশ্মীর যাব ভেবেছিলুম—যাঃ শালা, তোরা ক'টা জোয়ান মদ্দ আমাকে দেখতে আসিস কেন! লাই, সমস্তই লাই।'

রাগ, অভিমান, ভয়, বাঁচার ইচ্ছে—এইসবই ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারত। আর বাঁচবে না ছেলেটা, হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচবে না।

খুটখুট পায়ে নার্সরা ঘুরে বেড়ায়। রাত তিনটেয় পৃথিবীর দূরতম ঘড়িতে তিনটে বাজার ধ্বনি শোনা যায়। শেষ সিগারেটটি জ্বালার সময় দেশালাইয়ের আলোয় শ্যামল ঘড়ি দেখে নিয়েছিল, সাড়ে তিনটের কিছু বেশি। সময় যেন রবারের বলের মতো হঠাৎ লাফিয়ে বুকের ওপর পড়ল। তার পরের কথাবার্তা জমল না। বারণ সত্ত্বেও অমিয় আবার সিগারেট ধরাল; বুক পকেট

হাতড়ে সুপুরির কুচি পেয়ে মুখে দিল নিখিল; শ্যামল একবার ডান পাশে কাত হল, একবার বাঁ পাশে—তেমন জুত হল না। তিনজনের মধ্যে ওরই প্রথম আর একবার কেবিনে যাবার কথা মনে হল।

আস্তে উঠে পড়ল শ্যামল। একবার পিছনে বেঁকে একবার সামনে ঝুঁকে আলস্য তাড়াল। তারপর, যতটা সম্ভব শব্দহীন থেকে কেবিনে ঢুকল।

কনকের মুখের ভঙ্গি সন্দেহজনক। গায়ে এলোমেলো চাদর ফেলা; ডান হাতের কব্জি থেকে আঙুলগুলো চাবির গোছার মতো নিস্পন্দ বেরিয়ে আছে। কব্জিটা তুলে ও চাদরে ঢাকতে গেল—ছুঁতেই মনে হল টেবিল থেকে পেপারওয়েট তুলছে হাতে। ছোটবেলায় তুবড়ি বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনার পর ডান হাতের কড়ে আঙুলটা অল্প বেঁকে গিয়েছিল কনকের; সেই আঙুলটা, এখন, আঁকশির মতো শ্যামলের তালুতে লাগল। শ্যামল দ্বিতীয়বার সন্দেহ করল। তারপর টর্চ ফেলার মতো করে মুখের দিকে তাকাতেই দেখল দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিবটা একটু কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে, শিশুর আঙুলের মতো একটুকরো জিব, জিবের ওপর একটা বড় মশা। কেবিনের ভিতর থেকেই ও চেঁচিয়ে ডাকল, 'অমিয়! নিখিল!'

অমিয় আর নিখিল ঘরে ঢুকে শ্যামলের মুখের দিকে তাকাল। বুঝল, কনক মরে গেছে। ক' মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা—মৃত্যুটাকে অনুভব করার চেষ্টা করল। অননুভব্য বলেই আকস্মিক শূন্যতায় বুকটা ফাঁকা লাগল হঠাৎ।

অমিয়র হাতে তখনো জ্বলন্ত সিগারেট, নাকে গন্ধ পৌঁছুতেই দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে। শ্যামল ছিল কনকের বেডের সবচেয়ে কাছে, কি ভেবে সরে দাঁড়াল ও, প্রায় নিখিলের গা ঘেঁষে। কিছু

করার নেই এই বোধ মাথায় ধাক্কা দিতেই নিখিল সরে এল কনকের খুব কাছে, আলগোছে হাত তুলে রাখল কনকের কপালে। কি মসৃণ! কি শান্ত! কনকের মুখ, বন্ধ ছুটো চোখ, ওর বুকের ভিতর গুনগুন করে গেল। নিজের হাতের পিঠে একটা মশার হুল ফোটানো টের পেল নিখিল—মাথার ভিতর কিছু একটা ছুলে গেল চকিতে। এরই নাম তাহলে মৃত্যু! আঃ, কনক, বড় কম আয়োজনের মধ্যে মরে গেলি তুই!

অমিয় ডাক্তারকে খবর দেয়ার কথা ভাবছিল। তার আগেই নার্স এল, কনকের কব্জিটা তুলে নিল নাড়ি টেপার ছলে, উল্টে দেখল চোখের পাতা—তারপর, খুব চিন্তিত মুখে, খুটখুট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। পিছনে অমিয়।

শ্যামল বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কি হবে দাঁড়িয়ে থেকে!' ঠাণ্ডা গলায় বলল অমিয়, 'শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছিস না!'

'খেল খঁতম!' কমেণ্টারী রিলে করার মতো কৌতুক মাখানো চাপা গলায় বলল নিখিল, 'কাল থেকে ফ্লাস্কে চা আনব—কখন যেন বললাম!'

'নিখিল!'

শ্যামল ওর পিঠে একটা হাত রাখল, আর এক হাতে চাদরটা টেনে মুখ ঢেকে দিল কনকের।

ভোরের হাওয়ায় জানলার পর্দাটা ফুলে উঠেছে। হাজরা লেনে কনকের শোবার ঘরের পাশেই রাস্তা—খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা থেকে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। শূন্য ঘরের ভিতর খালি তক্তপোষটা এখন চুপচাপ পড়ে আছে অন্ধকারে। আর কোনদিন সেখানে ফিরবে না কনক। হোক হাসপাতাল, তবু যাবার আগে আলো বাতাস কাকে বলে টের পেয়ে গেল।

আগে অমিয়, পরে নিখিল, তারপরে শ্যামল—পর পর তিনজন বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। চুপচাপ। পর পর তিনজনে পা দিল সিঁড়িতে, নেমে এল চত্বরে। ভোর হতে তখন আর দেরি নেই। আবছা অন্ধকারে দুটো কাক উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। একটা ট্যাক্সি ছুটে গেল মেটারনিটি ওয়ার্ডের দিকে। অ্যাম্বুলেন্সটাকে পাশে রেখে ওরা গেটের কাছাকাছি চলে এল।

এরপর যা যা করা দরকার সবই জানা ছিল—প্রত্যূষের অপরিচ্ছন্ন আলোয় শ্মশানের সামনের রাস্তাটা দেখতে পেল ওরা। অমিয় আবার একটা সিগারেট চাইল; শ্যামল আগুন জ্বেলে নিজেরটাও ধরিয়ে নিল; নিখিল—স্মোকিং যার আদৌ পছন্দ নয়, অন্যমনস্ক হাতে একটা সিগারেট তুলে নিল শ্যামলের প্যাকেট থেকে। প্রায় একসঙ্গেই মনে পড়ল তিনজনের, কনক চলে গেছে।

কনকের মৃত্যুর পর ভোরের প্রথম হাওয়ায় কেমন হালকা, নির্ভার লাগল নিজেদের। রাত জাগার ক্লান্তিটা এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না। একটা ট্রাম চলে গেল লাইনের ওপর পিছলে পিছলে, সকালের প্রথম ট্রাম। প্রায় যাত্রীহীন। এখন গেলেই হয়—কনকের বাড়িতে খবরটা পৌঁছনো দরকার। কে যাবে?

দুরূহ কাজ। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ওরা হাসপাতালে ছিল—কনকের বাবা দাশরথি, বোন বুলা; থাকতে চেয়েছিল। ওরাই জোর করে বাড়ি পাঠিয়েছে। 'এখনও অনেক রাত জাগতে হবে—,' বলেছিল কেউ। তারপর এই ভোরবেলা! কি বিড়ম্বনায় যে ফেলে গেল কম্বুটা!

ঠিক হল অমিয় হাসপাতালে থাকবে, একজনের থাকা দরকার। শ্যামল আর নিখিল যাবে খবর দিতে। তিনজনেই একসঙ্গে এগুলো বাস স্টপের দিকে। না কি একটা ট্যাক্সি নেবে! স্টপে পৌঁছে ওরা আবার চারজন হয়ে গেল।

বয়সে কনকই ছিল ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সবচেয়ে তুখোড়, সবচেয়ে বেপরোয়া। শুকনো গাছ থেকে রস ছেনে প্রায়ই ম্যাজিক দেখাত। সবচেয়ে ধুরন্ধর আর খেয়ালের রাজা, সবচেয়ে পাজি। কুড়ি থেকে তিরিশে পৌছনোর মধ্যে বয়সটাকে থামিয়ে রেখেছিল এক জায়গায়। ট্রামে বাসে যেতে যেতে মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বুক-দেখা হ্যাংলা লোকজনের পা মাড়িয়ে দিয়ে হাসত মুখ টিপে। অফিসে নতুন জয়েন-করা ওপরঅলার হাত দেখে বলেছিল, 'জায়গামতো তেল দিয়ে যান, স্যার, আপনাকে কেউ আঁটকাতে পারবে না।' লোকটা চুপসে গিয়েছিল কেমন; কাজে অকাজে কনককে ডাকত ঠাণ্ডা ঘরে। 'ত্নটো থেকে সাড়ে তিনটে আমাকে ডাকবেন না।' কনক বলেছিল, 'ঐ সময়টা আমি ঘুমোই।' অমিয়র বউ রেখাকে প্রথম জপিয়েছিল কনকই। ক'দিন আলাপের পর অমিয়কে ধরে বলেছিল, 'একটা ফাস্ ক্লাশ মেয়ে আছে। বিয়ে করবি তো বল: না হলে সত্যজিৎ রায়কে ধরে ফিল্মে নামিয়ে দেবো।'

এইসব। বাঁচার জন্যে কোনদিন ওকে ভাবতে হয় নি। মাঝে মাঝে শুধু বিষণ্ণ হয়ে যেত বাবার ত্নটো 'প্যারালিটিক হাত' বুলা আর ঝুমির কথা ভেবে। মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করে বলত, 'শ্যামল, নিখিল, সৎপাত্র না হওয়া পর্যন্ত আমাকে শালা বলে ডেকো না।'

এইসব নিয়েই ফৌত হয়ে গেল। তেমন কিছুই তো ঘটে নি! মৃত্যুর জন্য যে-সব উদ্যোগ আয়োজন থাকে তার কিছুই ছিল না কনকের বেলায়। হলদেটে চেহারা, প্রায়ই ঘুষঘুষে জ্বর হত। ডাক্তার দেখাল, রক্ত পরীক্ষা হল, রোগটা ধরা পড়ল। সব ক'দিনের মধ্যে—ক' মাসের মধ্যে। মনে হয় সেদিনের কথা!

ভাবতে ভাবতে তিনরকম নিঃশ্বাস পড়ল তিনজনের। ছুটে গেলে এখনো কেবিনের বিছানায় চমৎকার শুয়ে আছে দেখতে

পাওয়া যাবে কনককে। তবু, সত্যি সত্যিই চলে গেল কনক!

ভোরের হাওয়ায় ডিজেলের গন্ধ শুঁকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শ্যামল, 'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি……'

২

'কখন ?'

বাজারের থলি হাতে সবে রাস্তায় পা দিয়েছিলেন দাশরথি ; ট্যাক্সি থেকে নেমে ওরা সামনে এসে দাঁড়াল।

মিটার দেখে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে ব্যস্ত শ্যামল। মুখোমুখি নিখিল। দাশরথির শূন্য দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে কোনরকমে বলল, 'এই তো, ভোর রাতে—'

'ও।' অল্প ঠোঁট কাঁপল দাশরথির। মাথা ঝুঁকিয়ে খুব মৃদু গলায় বললেন, 'তাহলে গেলই !'

বড় দুঃখময় কথাটা। যাওয়া। উচ্চারণের হেরফেরে হঠাৎ এক বুক শূন্যতা এনে দেয়।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন দাশরথি—পাকা অভিনেতার মতো ওই কথাটি বলবার জন্যই যেন এতদিন প্রস্তুত হচ্ছিলেন মনে মনে। দর্শকের হাততালির মতো গম্ভীর শব্দ তুলে খালি ট্যাক্সিটা চলে গেল পাশ দিয়ে।

দাশরথির মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পিছন দিকে টাক পড়েছে অল্প। বেঁটেখাটো. ধড়ের সঙ্গে সরু গলাটা বেমানান। অফিসপাড়ায় হাঁটতে চলতে এমন লোক হামেশা দেখা যায়। নিতান্ত কনকের বাবা, না হলে বয়স আন্দাজ করা যেত না। দেখেই মনে হয় নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা মানুষটি—থলি হাতে বাজারে যান সকালে, অফিসের সময়ে অফিসে, ফেরার ভিড়ে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকেন দূরে,

আর চিন্তায় ঘুম হয় না রাতে।

সহজ ! হ্যাঁ, সহজই। তবু, কথাহীন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ল শ্যামলের, কনকের অসুখটা বাড়াবাড়ি হবার পরও ছেলেকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজী হন নি দাশরথি ; বলেছিলেন, 'কেরাণী মানুষের সম্বল তো ওই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটি, ওতে হাত দেবো ! আমার তো শুধু একটিকে নিয়ে ভাবলেই চলে না !' 'লোকটা চামার !' আড়ালে অমিয়কে বলেছিল শ্যামল, 'জন্ম দিয়েই খালাস !'

এইসব ভেবে ছোট একটা ধাক্কা খেল শ্যামল। বুকের মধ্যে অল্প একটু চিন চিন করে উঠল। কোন্ ভাবনা থেকে সেদিন কথাগুলো বলেছিল এখন আর ঠিক মনে পড়ে না। দাশরথির সঙ্গে তাদের যে-টুকু পরিচয় তা কনকের জন্যই। কনক মারা গেল—মৃত্যুর প্রস্তুতি থেকে এ-পর্যন্ত খুব আপনজনের মতো দাশরথির সঙ্গে মেলামেশা করেছিল তারা। এখনই তাঁকে দূরত্বময় মনে হচ্ছে। এরপর কি হবে ভেবে নিজের ভিতর ডুবে গেল শ্যামল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। চটির ডগা ঘষে কংক্রীটের ওপর দাগ কাটার চেষ্টা করছিল নিখিল। ভিতরে হাতকাটা গেঞ্জি, ঘামে জ্যাবজ্যাবে জামার কাঁধদুটো স্পষ্ট। নিখিলের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল শ্যামল।

'মেসোমশাই !'

'হ্যাঁ, শুনছি।' বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন দাশরথি। 'একটু ভেবে নিচ্ছি। মানে—বুঝতেই পারছ, ও যে সত্যি সত্যিই চলে যাবে—'

'আপনি ভেঙে পড়বেন না—'

এ-ক্ষেত্রে যা বলা হয় ও যে-রকমভাবে, ঠিক তেমনি, অভ্যস্ত

গলায় কথাটা বলল শ্যামল। চোখের ইশারায় নিখিলকে কিছু বলে, বাজারের থলিটা আস্তে টেনে নিল দাশরথির হাত থেকে।

'চলুন। বাড়ি চলুন—'

'চল। আজ আর বাজারে যাব না, কি বল?' দাশরথি বললেন, হাঁটতে হাঁটতে। 'কাল রাতে ফিরে আমরা সবাই কনকের গল্প করলাম। কাল তো দেখে মনে হয়েছিল বেঁচে যাবে। মনটা ভাল ছিল। বড় হবার পর তো কখনো বাপ বলে ডাকে নি। কাল হঠাৎ ডাকল, হাতটা ধরল। তোমরা কি কেউ কাছে ছিলে? বললাম, কি রে, কিছু বলবি? বলল না তো কিছু। শুধু হাসল। তখন কিছুই বুঝি নি—'

কথা থামিয়ে হঠাৎ দিশেহারা চোখে তাকালেন দাশরথি। চোখ মুখ ভেঙে যাচ্ছে। থেমে দাঁড়িয়ে বুক পকেট থেকে একটা আস্ত দশ টাকার নোট বের করে অদ্ভুত কাঁপা গলায় বললেন, 'এই ছাখো, ওর জন্যে মাছ কিনব বলে আজ বেশি টাকা নিয়েছিলাম—'

ওরা এগোতে লাগল।

সামনে কনকদের বাড়ি। রাস্তার ধারে খোলা জানলা। যে-রকম ভেবেছিল, বাইরে থেকেই শূন্য তক্তপোষটা চোখে পড়ে। খুব চেনা ছবি। জানলার পাল্লায় বড় পেরেকটা একইরকম-ভাবে গাঁথা। পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে অফিস যাবার আগে প্রতিদিন দাড়ি কামাত কনক। গালভর্তি ফেনা নিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'এই ঝুমি, তাড়াতাড়ি বাথরুম খালি কর।'

এক রবিবারের সকালে চা দিতে এসে ঝুমি বলেছিল, 'আপনারা দাদাকে একটু সভ্য করতে পারেন না! বাথরুম তো সকলের বাড়িতেই থাকে, অত চেঁচিয়ে লোককে জানানোর কি আছে!'

মনে পড়ার ব্যাপার আরো কত্তো!

শূন্য তক্তপোষটার দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক কিছুই বোধ হল না নিখিলের। কনকের থাকা আর না-থাকার মাঝখানে বিরাট ব্যবধান—অথচ ব্যবধানটা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। এ ক'দিন পর পর রাত জেগে তেমন ক্লান্তি লাগে নি। এখন মনে হচ্ছে কনক নয়, অন্য কোন আকর্ষণ তাকে ব্যস্ত রেখেছিল মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দিনের পর দিন, সময়ের পর সময়। এখন সে-সব কিছুই নেই। এখন শুধুই ক্লান্তি, অবসাদ। ঘামের মতো ঘুম গড়িয়ে পড়ছে শরীর বেয়ে।

পিছন থেকেই নিখিল দেখল দাশরথিকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল শ্যামল। এতক্ষণ নানারকম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিলেন দাশরথি, একটু বা চড়া গলায়, অন্তত রাস্তায় চলমান মানুষের গলায় নয়। সাধারণত কম কথার মানুষ; হাবভাব দেখে বাড়ির সঙ্গে ওঁর অভিভাবকত্বের সম্পর্কটা খুবই আল্‌গা মনে হত। ছুটিছাটার দিনে সকালের দিকে কখনো-সখনো এ-বাড়িতে এসে দেখেছে সদর-ঘেষা ফালি জায়গাটুকুতে উবু হয়ে বসে এক মনে খবরের কাগজ পড়ছেন দাশরথি। পায়ের শব্দে ঈষৎ চোখ তুলেই নামিয়ে নিতেন আবার—যাও, ভিতরে যাও। প্রায় অভ্যাসেই বলতেন। কনকের থাকা না-থাকার সঙ্গে ওঁর নির্দেশের বড় একটা সম্পর্ক থাকত না। এরপর, নিখিল ভাবল, কনকের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরেও হয়তো কোনদিন এসে সে একইভাবে উবু হয়ে বসে কাগজ পড়তে দেখবে দাশরথিকে, একই গলা শুনবে। কেন যেন মনে হল নিখিলের, দাশরথির পক্ষে সেটাই সম্ভব। এই মৃত্যুটা উপলক্ষ মাত্র, একটু নাড়া দিয়ে গেল। না হলে এর আগে আরো অনেক মৃত্যুর স্তর পেরিয়ে এসেছেন দাশরথি।

অন্যমনস্কভাবে, প্রায় না-চলার ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে নিখিল তার সর্বাঙ্গে মৃদু ঘুম ছড়িয়ে পড়ছে টের পেল। হাই তুলল আলতো।

যতদূর মনে হয় পুত্রশোক সইয়ে নেবেন দাশরথি। ভয় বসুধাকে নিয়ে। কনকের মা। টানা একটি মাস গোটা পৃথিবী-টাকে হাসপাতালের বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল কনক—যা-কিছু ভাবনা সবই সম্ভাব্য মৃত্যুকে ঘিরে। ওরই মধ্যে একা অচঞ্চল বসুধা। চুপচাপ শান্ত মানুষটি, এই এক মাসে যেন আরো বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে প্রায়ই যেতেন না ; মাঝে মাঝে মনে হত রুগ্ন ছেলের সংস্পর্শ ভাল লাগছে না বসুধার। সুযোগ পেলেই চলে যেতেন কালীঘাটে, যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। মনে হত, জাগতিক ব্যবস্থার বাইরে কোন অমোঘ শক্তির সন্ধান পেয়ে গেছেন বসুধা ; ভালো মন্দ যা'ই হোক, তাঁর সমস্ত রফা সেই শক্তির সঙ্গে। যেন সারাক্ষণ সেই শক্তিকে টেনে আনতে চাইছেন নিজের মধ্যে—মূল থেকে শিকড়ের মতো যার গাঢ় সঞ্জীবনী ছড়িয়ে পড়বে কনকের ভিতর, ভাল হয়ে উঠবে কনক।

'একদিন কালীঘাটে নিয়ে যাবে?' মাঝে মাঝেই বলতেন, 'বিকেলের দিকে চুপি চুপি চলে যাব। ঐ সময় ভিড়টাও কম থাকে।'

একদিনের কথা। পুজো দিতে ভিতরে গেছেন বসুধা, সে অপেক্ষা করছে বাইরে। খানিক পরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে নিখিল?'

'টাকা কি করবেন মাসীমা?'

অসহায় মুখ বসুধার। খানিক চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চোখ দেখে মনে হল মা তুষ্ট হন নি, আমার কথা শুনছেন না। তাই আরো দিতাম!'

রাগ, দুঃখ সব মিলে একটা প্রচণ্ড শক্তি ছটফট করে উঠেছিল নিখিলের মধ্যে। পারা যায় না ধাতু মাটির তৈরী রঙীন পুতুলটিকে মুষ্ট্যাঘাতে ভেঙে দিতে! ভেবেছিল, তবু সাহস হয় নি বসুধার

চোখের দিকে তাকিয়েই। বসুধার বিশ্বাস দৈবের ইচ্ছেতেই আরোগ্য হবে কনক। সেই আশ্বাসটুকু কেড়ে নিলে কোথায় দাঁড়াবেন বসুধা !

টাকাটা হাতে পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন বসুধা। 'তুমিও এসো না বাবা ?' নিখিলের হাত ধরে বলেছিলেন, 'আসবে ? কনক তো তোমারও বন্ধু !'

চটিটা বাইরে রেখে ধীর পায়ে বসুধাকে অনুসরণ করেছিল নিখিল। মেয়ে-পুরুষের গিসগিসে ভিড়ে বসুধার পিছনে পিছনে সোঁদা মেঝেয় হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিল দেবীর কি অপরিসীম শক্তি —স্থবির দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি ভক্তের রক্তমাংসের যাবতীয় ঘ্রাণ শুষে নিচ্ছে যেন ! বসুধা থালার ওপর টাকাটা রাখতেই একসঙ্গে তিনজন সেবায়েত ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোঁচকানো মুখে মুদিত চক্ষু বসুধার কাঁধদুটো আলগোছে ধরে নিখিল বলল, 'মাসীমা, চলুন—'

বাইরে বেরিয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন বসুধা।

'ও ভাল হয়ে উঠবে নিখিল। আমার মন বলছে কনু ভাল হয়ে উঠবে।'

কষ্টের সংসার। রিক্সায় ফিরতে ফিরতে নিখিল ভেবেছিল, ওই টাকায় একদিন ওরা পেট ভরে মাংস খেতে পারত।

'জানো, নিখিল—', কথায় পেয়েছিল বসুধাকে। 'বহরমপুরে আমার শ্বশুরবাড়ির সিঁড়িগুলো ছিল উঁচু আর পিছল। কনু তখন পেটে, একদিন পড়ে গেলাম। সে কি কষ্ট ! নিজের চেয়ে বেশি পেটেরটার জন্যে। সবাই ভাবলে বাঁচবে না। কিন্তু—'

একটু থেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বসুধা।

'ছেলে ঠিক এল কোল জুড়ে। সেদিনও তো একটা কিছু হতে পারত বাবা !'

প্রায় ঘুমের মধ্যে পর পর অনেক স্বপ্ন ও দৃশ্য পার হয়ে এল নিখিল। প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো। খেয়াল হতে বুঝল সে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, প্রায় একই জায়গায়। এখান থেকে কনকদের সদরের দূরত্ব তেমন কিছু নয়। তাকে ঘিরে চারদিকে রোদ বেড়ে উঠছে তরতর করে। পিছনে তাকাতেই চোখে পড়ল কনকের ঘরটা—শূন্য তক্তপোষের ওপর চুপচাপ বসে আছে বুলা। ভিতর থেকে ইনিয়ে বিনিয়ে ভেসে আসছে চাপা কান্না। আর সবই ঠিকঠাক চলছে। শব্দ, আলো, বাতাস, মানুষজন। বেঁচে থাকতে যাকে মনে হত অনেকখানি— প্রচণ্ড আর চঞ্চল, সেই কনক মারা যাবার পর এতটুকু বদলালো না পৃথিবী!

আলতো হাতে কপালের ঘাম মুছে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নিখিল।

'বুলা—'

রাস্তার দিকেই চোখ, তবু যেন খুব অন্যমনস্ক বুলা। নিখিলকে লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। গলা শুনে এগিয়ে এসে শিক ধরে দাঁড়াল।

'ভেতরে আসবেন না?'

'কি হবে!'

একটু অপেক্ষা করল নিখিল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'মাসীমা জানেন?'

বুলা মাথা নাড়ল আস্তে। বিছানার পোষাকে বলেই এত ঢিলেঢালা লাগছে এখন। চোখ দুটো ফোলা। রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয়েছে বুলার। খানিক আগে দাশরথির কথা শুনে মনে হয়েছিল গত রাতে চমৎকার ঘুম ছিল ওদের চোখে। এখন হয়তো অনেকদিন থাকবে না।

নিখিল বুলার চোখে জল জমতে দেখল। চোখ ফিরিয়ে নিল।

'আমি গেলে এতটা হত না। মা বাবাকে সামলানো যাবে না নিখিলদা! দাদা বড় ক্ষতি করে গেল!'

'ভেবো না। এখন ওসব ভাববার সময় নয়।'

ভিতর থেকে একটা ছুঁচ-বেঁধা কান্না শুনল নিখিল। ঝুমি নিশ্চয়। পাশাপাশি অস্পষ্ট গলা শ্যামলের। এখন তার একবার ভিতরে যাওয়া দরকার।

'এখন শান্ত হতে চেষ্টা করো—।' দয়ালু গলায় কথাটা শেষ করল নিখিল। কথাগুলো ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে মুখে। না, সে স্বাভাবিকই আছে।

তারপর ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

৩

বেলা বারোটা নাগাদ কনকের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল শ্যামল।

কমন লাইনটা বার বার এনগেজড্ পাচ্ছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে ডাইরেক্ট লাইনে রিং করল। ফোন ধরল কনকের সেই ওপরঅলা, মুখুজ্জ্যে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে এর আগেও দু' একবার কথা হয়েছে। ভীরু প্রকৃতির ; কনক সম্পর্কে ভীতির কারণেই ওর বন্ধুবান্ধবদেরও সন্দেহের চোখে দেখে, সমীহ করে একটু। চেনা গলা। শ্যামল নিজের পরিচয় দিতেই নার্ভাস গলায় বলল, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার বন্ধু তো আসছেন না···অসুস্থ···'

অন্য সময় হলে বাজিয়ে নিত শ্যামল, গলার স্বর অল্পস্বল্প পাল্টিয়ে রগড় করে নিত একটু। অনেকবারই করেছে। এখন সে-সব প্রশ্নই ওঠে না। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। কনক আজ সকালে মারা গেছে।'

'অ্যাঁ! বলেন কি!' ফোনের মধ্যেই চেয়ার ঠেলার শব্দ শুনল শ্যামল। মুখুজ্জ্যে বোধহয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ডু ইউ আস্ক্ মী টু বিলিভ ইট্!'

শ্যামল সাড়াশব্দ দিল না। ভাবল ফোনটা ছেড়ে দেয়। ওপাশে আবার মুখুজ্জ্যের বিব্রত গলা, 'হ্যালো···হ্যালো··· শুনছেন?'

'বলুন—'

'ইট্ ইজ্ এক্স্ট্রিমলি শকিং।' একটু বিরতি। 'কি বলছেন, অফিস ছুটি দিয়ে দেবো?'

'সেটা আপনারা ভাবুন।'

ফোনটা নামিয়ে রাখল। চাপা গলায় বলল, 'ইডিয়েট!'

পাশে দাঁড়িয়ে অমিয়। একটু আগে সে ছোট ভাই দ্বিজুকে ফোন করেছে মা-কে নিয়ে শীগগির যেন চলে যায় কনকদের বাড়ি। মৃত্যুর খবর পাবার পর থেকে একটি কথা বলেন নি বসুধা, তাঁকে সামলানো দরকার। অফিসে খবর দেবার কথাটা অমিয়রই প্রথম মনে পড়ে।

'কি হল!' শ্যামলকে বিরক্ত দেখে জিজ্ঞেস করল অমিয়।

'মুখুজ্জ্যে ধরেছিল। বলল খুব শক্ড্। সব শালাকেই জানা আছে। এক মাস হাসপাতালে থাকল, একদিন দেখে যেতে পারত!'

'ওসব ভেবে লাভ নেই।'

মাথার ওপর চড়া রোদ। শ্যামল ছায়া খুঁজল। নিঃশব্দে রোদ্দুর পেরিয়ে শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল দু'জন।

'রেখার কি হল? গেছে?'

'না।'

'কেন?'

একটু বা অসহিষ্ণু চোখে শ্যামলের মুখের দিকে তাকাল অমিয়। বিরক্ত। জবাব দিল না।

শ্যামল বলল, 'গেলে পারত।'

'জানিস তো সবই।' শুকনো হাসল অমিয়। 'আমিই মানা করলুম। এ অবস্থায় কোনরকম টেনসন ফেস করা ঠিক হবে না।'

'রেখা কিছু বলল না?'

'কি?'

'শেষ দেখা দেখতে চাইল না ?'

অমিয় জবাব দিল না। গেটের কাছে নিখিলকে দেখল, সঙ্গে মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক, সম্ভবত কনকের মামা। দমদমে খবর দিতে ছুটেছিল নিখিল। বিরক্ত মুখে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অমিয় বলল, 'তুই কি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি ? আমি একটু ওদিকটা দেখে আসি।'

'যা—'

অমিয় চলে গেল। অনিচ্ছুক মনে আর একটা সিগারেট ধরাল শ্যামল। দু'টান দেবার পরই বিশ্রী, বিস্বাদ লাগল। ফেলে দিয়ে চটির তলায় আগুনের টুকরোটা চক্রাকারে পিষতে লাগল। কেমন একটা রাগ বুকের মধ্যে ঠেলে উঠছে থেকে থেকে। কেন, বুঝতে পারছে না। তবু রাগ, ভয়ঙ্কর রাগ গলার ভিতর জলকণা শুষে নিচ্ছে।

খানিক আগে, প্রায় অকারণেই, কেবিন ভেকাণ্ট করা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া হল। এক কথা থেকে আর এক কথায় পড়ল। শ্যামল বলল, 'আপনাদের পরামর্শে আমরা স্পেশাল অ্যাটেণ্ডেণ্ট রেখেছিলাম। পেশেণ্ট মারা যাবার সময় তাকে অ্যাটেণ্ড করা হয় নি। তাকে মশায় ছেকে ধরেছিল।'

'বেশ তো', ডাক্তার বলল, 'কোন কমপ্লেণ্ট থাকলে ইন রাইটিং দিন। মশা না থাকলে পেশেণ্ট বাঁচত কিনা আমরা এনকোয়ারি করে দেখব।'

'রাখুন মশাই আপনাদের এনকোয়ারি।' চড়া গলায় বলেছিল শ্যামল, 'এখানে যে ও এতদিন বেঁচেছিল এটা পেশেণ্টের বাবার ভাগ্যি—'

মুহূর্তে চোখ মুখ লাল হয়ে গেল ডাক্তারের। নিরস্ত হবার জন্য হাতের স্টেথ্‌স্‌কোপটা ঝাড়ল দু'বার। 'আপনারা শিক্ষিত,

াক', কোনরকমে বলল, 'ভুলে যাবেন না এটা হসপিট্যাল—'

াগে মাথার ভিতর শিস্ জ্বলে উঠল শ্যামলের। ভঙ্গি দেখেই অমিয় বুঝল কিছু একটা হবে। তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনল ওকে।

'এমন অ্যাবনরমাল ব্যবহার করছিস কেন!' বাইরে এসে বলল, 'এটা কি রাগারাগির সময়!'

'তুমি আমাকে জ্ঞান দেবে না, অমিয়। তোমাদের জানা আছে।'

ক্রিমির মতো লাল সরু কয়েকটা শিরা শ্যামলের চোখে, তেল না-পড়া উস্কোখুস্কো চুল, গালের শক্ত হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু মনে হয়। অকারণ, সমস্ত অকারণ; তবু ওর ভাবগতিক দেখে চুপ করে গেল অমিয়।

একা দাঁড়িয়ে শরীরে রোদের তাপ সইয়ে নিল শ্যামল। তখন সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। কেন ঠিক বুঝতে পারে না। এটা ঠিক, কনক যেতই, দু'দিন আগে আর পরে—এই যা। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে যত্নের কোন ত্রুটি হয় নি—এত ভালোবাসার মধ্যে খুব কম জনই যায়। তবু কেন মনে হচ্ছে কোথায় একটু ফাঁক থেকে গেল; যা যা পাবার ছিল, পেতে পারত, সবকিছু দেয়া গেল না ওকে!

এই মুহূর্তের আবেগ আর অভাববোধ ধসিয়ে দিল শ্যামলকে। আকাশভরা রোদ্দুরের নিচে দাঁড়িয়ে ওর সমস্ত স্নায়ু চাপা কান্নায় কেঁপে উঠল হঠাৎ।

শনিবার। হাফ-ডে। তার ওপর খবরটা ঠিক সময়েই পেয়েছিল। মিনিট কতকের মধ্যেই ট্যাক্সি চেপে কনকের অফিসের কয়েকজন এসে পড়ল। পর পর পাঁচজন।

'ডেডবডি কোথায়?'

হত্যাকাণ্ডের পর সরেজমিন তদন্তে এসে পুলিশ এইভাবে জিজ্ঞেস করে। বেল্ট বাঁধা ট্রাউজার্সের ঘের ছাড়িয়ে মোটা পেট ঝুলে এসেছে বাইরে, ফুলসার্টের হাত গোটানো, মোটামুটি ধুমসো চেহারা। শুনে মনে হয় সারা রাস্তা প্রশ্নটা ভেঁজেছে মনে মনে, এসেই উগরে দিল।

শ্যামল বলল, 'ঐদিকে।'

দিক স্পষ্ট না হোক, যাকে বলা হল তার পক্ষে যথেষ্ট। অন্যদের দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'তোমরা আসবে নাকি ?'

'আপনি যান।'

লোকটা চলে যাবার পর শ্যামল অন্যদের মুখ দেখল। প্রবীণ লোকটি বিড় বিড় করে বলল, 'মেলানো যায় না। মেলানো যায় না।' তারপর অনতিদূরে দারোয়ানের জন্য রাখা খালি টুলের ওপর বসে পড়ল।

সুদেবকে চিনতে পারল শ্যামল। কনকের ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি টেবিলে বসত; পাতলা, দোহারা গড়ন। বড় খেলা থাকলে এক একদিন কনকের সঙ্গী হয়ে মাঠে গেছে। আর সবাই অপরিচিত।

নৈঃশব্দ্য মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন এখন। শ্যামল কিছুটা বিমূঢ় বোধ করল। দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলি তার স্নায়ুর ওপর চাপ দিচ্ছে। ওরা কনকের কেউ নয়, বা আলাদা করে কনকের কেউ নয়—বলা যায় যে-কোন মৃত্যুর সংবাদ পাবার জন্য তৎপর ক'টি মুখ। যে-কোন উপলক্ষেই ভালকান স্মিথ্ লিমিটেড নামক কোন এক কোম্পানীর সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে ছুটে যায়। মৃত্যু যাদের কাছে 'ডেডবডি' মাত্র, আর কিছু নয়।

শ্যামল তলিয়ে যাচ্ছিল। দেখল ঘাড়ের পিছনে সার্টের কলার তুলে মোটা লোকটি ফিরে আসছে। মুখে কাজ হাঁসিলের হাসি। দূরে থাকতে থাকতেই শ্যামল সুদেবকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটি কে ?'

'নৃসিংহদা। আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী।'

'মাতব্বর !' মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল কথাটা। এই ধরনের লোক দেখলেই কেমন হাত নিসপিস করে। নৃসিংহ কাছে আসতেই মুখ ব্যাজার করল শ্যামল।

'একেবারে 'কাম' ফেস্‌! বলি নি তোমাদের, হি ডায়েড লাইক এ হিরো—।' খুব তৎপর হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল নৃসিংহ। 'কাল মীটিং চালাবার সময়েই হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল কনকের কথা, আজ বিকেলেই আসতাম দেখা করতে। বাট—', একটু থেমে নাটকীয় গলায় বলল, 'পুওর চ্যাপ! হি ডিড্‌নট্‌ ওয়েট ফর আস্‌!'

'বক্তৃতা পরে করো হে।' নৃসিংহ চুপ করতে টুলে-বসা প্রবীণটি বলল, 'যাত্রার জোগাড়যন্তর কি হল ছাখো। কেউ কেউ তো আবার শ্মশানে যাবে বললে।'

সুদেব এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। শ্যামলের কাছাকাছি এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ? কেওড়াতলায় ?'

'কেওড়াতলায়—'

'কোলিগদের অনেকেই যাবে। আমি বরং একটা ফোন করে দিই। কখন যাবেন ?'

'গেলেই হয়—'

অল্প ইতস্তত করল সুদেব।

'ওঁর বাড়ির লোকজন এসেছেন ?'

শ্যামল ঘাড় নাড়ল। নৃসিংহের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই

বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এখন তার মনে কনক নেই। পরিবর্তে নিজের ছোটখাটো স্মৃতি এসে ভিড় করছে। খুব খাপছাড়া, একটার সঙ্গে অন্যটা সম্পর্কহীন—তবু আলাদা করা যাচ্ছে না। হাওড়া স্টেশনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের দেখে যেমন বোঝা যায় না কোন ট্রেনে এল।

প্রথম স্মৃতি বাবা। বোলপুরের বাড়িতে এনলার্জ করা একটা বড় ছবি দেয়ালে টাঙানো থাকে, নিচে লেখা : ১৯০৬-১৯৬১। ছবির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই মনে পড়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল বাবার। নিজের বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেল, আর খুব বেশি দিন বাঁচা যাবে না—হয়তো আরো পঁচিশটা বছর।

আর কিছু মনে হয় না, আর কিছু ভাবতে পারে না। বাবা সম্পর্কে কোন গভীর স্মৃতি বা বেদনাবোধ তার মনে নেই। কোন অভাবও নেই। মৃত্যুর তারিখটা ছিল একুশে মে। মাঠে জোর খেলা ছিল সেদিন, তুমুল বৃষ্টিতে শেষ দিকে ভেঙে গেল খেলা—সে, নিখিল আর কনক ভিজে কাক হয়ে ঢুকেছিল ধর্মতলার এক চায়ের দোকানে। বেশ রাত করে মেসে ফিরে টেলিগ্রাম পেয়েছিল, ফাদার এক্সপায়ার্ড।

তেমন কিছু মনে হয় নি। বৃষ্টিতে ট্রেন ধরে ছুটে যাবার উপায়ও ছিল না তখন। শুধু একটা চাঞ্চল্য, টেলিগ্রামটা উল্টেপাল্টে পড়েছিল বার বার, খেতে বসে মনে হয়েছিল মাছ খাওয়া উচিত হবে না। পরদিন বেলায় বাড়ি পৌঁছে দেখেছিল থান পরে চৌকিব ওপর বসে আছেন মা ; একপাশে গায়ে ধুতিজড়ানো দাদা, গলায় সুতোয় বাঁধা চাবি। আড়ালে ডেকে কোরা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বৌদি বলেছিল, ‘সেই এলে ঠাকুরপো, একদিন আগে এলে না কেন !’

ঘন হয়ে ভাবলে এইসবই মনে আসে। মৃত্যুর তারিখটা তবু

ভুল হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন খেয়াল হয়, বাবার মৃত্যুর পর আরো একটা বছর কেটে গেল। বহুদিনের মধ্যে একটি মাত্র দিন—দিনটিকে তবু ধরে রাখা যায় না, ইচ্ছে সত্ত্বেও না।

দুঃখিতভাবে নিঃশ্বাস চাপল শ্যামল। এ-বছর, মনে পড়ে, ঐ একই দিনে ঝুমিকে নিয়ে ম্যাটিনী শো দেখেছে দুপুরে, অফিস পালিয়ে। সন্ধ্যেয় যথারীতি আড্ডা দিয়েছে চায়ের দোকানে বসে। রাতে ফেরার পর মা'র পোস্টকার্ড পেয়েছিল—তোমার বাবার মৃত্যুর পর আরো এক বছর কেটে গেল। কত তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়। মনে হয় যেন মানুষটিকে দেখতে পাই সর্বদা। খোকন, যেখানেই থাকো মনে রেখো তোমাদের বাবা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন, তাঁর আশীর্বাদ সব সময় তোমাদের ঘিরে আছে—

'ওঁর রাশি কি ছিল? মেষ?'

শ্যামল একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ প্রশ্নে থতমত খেয়ে তাকাল। সেই প্রবীণ লোকটি, খানিক আগেই মেলানো যায় না, মেলানো যায় না বলতে বলতে বসেছিল দূরে গিয়ে। এখন একেবারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেন বলুন তো?'

'নাঃ, এমনিই।' একটু হাসল, 'হিসেব কষে দেখলুম, মেষেই সম্ভব। শনির রোষ পড়েছিল। সময় থাকতে কিছু একটা ধারণ করলে—'

কথা শেষ হল না। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে নৃসিংহ বলল, 'আপনারা নাকি সংকার সমিতির গাড়ি বুক করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ইস্—!' মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল নৃসিংহ, 'একবারই কাঁধে চেপে যেত, মশাই! সেটাও হতে দিলেন না!'

ওয়ার্ডে ঢোকার গেটের মুখে ছোটখাটো জটলা। গেটের মুখে

মুণ্ডু ঢুকিয়ে একটা কালো গাড়ি জায়গা ঠিক করে নিচ্ছে। ওখানে নিখিল দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি দ্বিজু। বুঝতে দেরি হল না। পর্যাপ্ত আলো আর রোদ মাথায় অফিসের জটলা ফেলে সেদিকে হাঁটতে গিয়ে বুকের ভিতরটা সামান্য মুচড়ে উঠল শ্যামলের। কত তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময় !

৪

সকাল থেকেই আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন দাশরথি। ভাঙলেন একেবারে শেষ বেলায়, দাহর শেষে—ভালয় ভালয় সব চুকে গেল এইরকম একটা ধারণা যখন সকলের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

মনে হয়েছিল মানুষটি নির্বিকার, স্পর্শ থেকে বহুদূরে। যা যা করতে বলা হল বা করা উচিত, করলেন মুখ বুঁজে, ধীর মাথায়, খটখটে চোখে। দেখে মনে হবে, এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, ঝড়ের সব হাওয়া যেন ওঁর আশপাশ দিয়েই চলে গেছে। একইরকম দাশরথি—থলি হাতে বাজারে যান সকালে, অফিসের সময় অফিসে, ফেরার ভিড়ে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকেন দূরে—আর চিন্তায় ঘুম হয় না রাতে।

ট্যাক্সিতে তুলে দিতে ওরা তিনজনেই গেল। ভিতরে অলোক, কনকের ছোট; তার ওদিকে পাড়ার কেউ। সামনে কনকের মামা। গঙ্গাজলের ঘটিটা অলোকের হাতে তুলে দেবার সময় পর্যন্তও কিছু বোঝা যায় নি। ট্যাক্সির দরজাটা ঠেলে বন্ধ করতে যাচ্ছিল অমিয়, দাশরথি হঠাৎ ওর হাতটা ধরে ফেললেন—

'পুত্রশোক কেমন তোমরা আমাকে বলে দাও!' ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন দাশরথি, 'এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না কেন…'

অমিয় বুদ্ধিমান। দাশরথি নেমে আসছেন দেখে তাড়াতাড়ি

দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলল। পিছনের কাঁচে জলে-ঘষা একটি ঝাপ্‌সা মুখ অনেকক্ষণ লেগে থাকল। শ্মশানের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে তিনজন কনকের মুখ মনে করার চেষ্টা করল।

তখন বিকেল। কিছু দেরি আছে সন্ধ্যে হতে। চারদিক ছেঁকে হাওয়া আসছে। বিকেলে সাবান মেখে চানকরা যুবতীরা পাফ্‌-করা ঘাড় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, ভেঁপ্‌ ভেঁপ্‌ করে হর্ন্‌ দিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি, বুড়ি আয়ার হাত ধরে টলমলে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিশু। আর যা সবই যথাযথ। আলাদাভাবে তিনজনের কিছুই মনে পড়ল না। মনে পড়ল, কনক চলে গেছে।

অলস ভঙ্গিতে চুপচাপ খানিকটা হেঁটে এল ওরা। মন্থর পা দুটো শুধু কোনরকমে টেনে চলা। কিছুটা এসে আবার থেমে দাঁড়াল, খুব সাধারণভাবে সিগারেট ধরিয়ে নিল পরস্পরের হাত থেকে। তারপর হাঁটতে শুরু করল আবার।

'কতদিন ভুগল কনু ?' প্রথম কথাটা নিখিলই বলল, 'তিন মাস ?'

'না, অতদিন না। অমিয়, কত দিন রে ?'

'ওই রকমই। মাস আড়াই—।' খুব জোরে মাথা নাড়ল অমিয়, নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে। 'মনে হচ্ছে নিজের দোষেই গেল।'

'কেন !'

'মনে হচ্ছে। কেন জানি না।'

'শেষের দিকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। পরশু হঠাৎ বলল, সিক্রেটলি খবর নিস তো বাবার কত টাকা গেছে এ-পর্যন্ত—'

'কেন ?'

'যতটা বাঁচে। মরেই যদি যাই, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল, বলেছিল—'

'বড় ইচ্ছে ছিল বাঁচার—'

'কার না থাকে!' নিখিল সোজাসুজিই বলল, 'তোর নেই? আমার নেই?'

আবার চুপচাপ। সামনে পড়ে আছে রাস্তা। আর স্তব্ধতা। কাল পর্যন্ত ব্যস্ততা ছিল, খানিক আগে পর্যন্তও ছিল। এখন আর কিছু নেই।

তিনজনে তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে এ ওর মুখ দেখে নিল।

৫

সামনের রাস্তাটা বড় দীর্ঘ মনে হয় অমিয়র। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। অথচ মানুষজন চলে, চলে শব্দ, ট্রাফিক সঙ্কেতে মাছের ঝাঁকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি গাড়ির ঝাঁক, আবার চলতে শুরু করে—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর—চলার কোন বিরাম নেই।

ইচ্ছে করলেই অমিয় উঠে পড়তে পারে। অনিচ্ছায় ওঠে না। ক্লান্তির সঙ্গে ভোঁতা দুঃখ এসে মেশে—একা হবার পর থেকেই অসহায় বোধ তীব্র হয়ে ওঠে তার মধ্যে। রাস্তা পার হতে গিয়ে কয়েকবারই তার মনে দ্বিধা জাগে, হাঁটু কাঁপে। অমিয় বুঝতে পারে না কেন রাস্তা পার হওয়া তার পক্ষে জরুরী। সে এখন বাসে বা ট্রামে উঠবে না, অন্য কোন ব্যস্ততাও নেই। রেখা? না, রেখার জন্যও এখন সে কোনরকম চাঞ্চল্য বোধ করছে না।

অপরিসীম দূরত্ব নিয়ে কিছু না ভেবেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল অমিয়।

খিদে পেয়েছিল, খেল না। চা নিল। চায়ের কাপে একাকী চুমুক দিতে দিতে সে একরকম কুণ্ঠা বোধ করল। চায়ের প্রস্তাবটা করেছিল শ্যামল, বাড়ি ফেরার নামে সে ওদের বিদায় করেছে। তেমন কোন কারণও যে ছিল তা নয়। শুধু ভাল লাগছিল একটু একা থাকতে, একা থেকে যেমন তেমন করে সময় কাটিয়ে দিতে। অনেকদিন তারা একসঙ্গে ছিল—কতদিন, ঠিক ঠিক মনে পড়ে না।

তং,বহুদিন। আর কি থাকবে ?

কে জানে ! হয়তো থাকবে না।

একত্র থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। চারদিক থেকে উল্টেপাল্টে এতদিন দেখেছে নিজেকে। চারটে দেয়ালের মতো ঘর করে কিছু একটা পাহাবা দিচ্ছিল, এতদিন—কি পাহারা দিচ্ছিল ?

বোধহীন শূন্যতায় চায়েব কাপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে রাখল অমিয়। কিছু একটা কিছু একটা করতে কবতে সিগারেট জ্বালিয়ে বুকের শূন্য জায়গাটুকু ধোঁয়ায় ভরে তুলল। একভাবে, অনেকক্ষণ। কিছুই তার মাথায় এল না। কনকেব মৃত্যুর জন্য বিশেষভাবে তাকে কিছু বিঁধল না। ভাবল, দিন চলে যাবে।

না যাবার কিছু নেই। ঘব সংসাবে এখন থেকে সে আর একটু ব্যস্ত হয়ে পড়বে। রেখা পাঁচ মাসেব অন্তঃসত্ত্বা। দেখতে দেখতে সন্তান এসে পড়বে। নাঃ! সে ভালই থাকবে।

দিনগুলিকে রুটিনে বাঁধতে বাঁধতে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাস্তায় নামল অমিয়। বাসে উঠে চমৎকার ঘামের গন্ধ পেল। সে আর কিছু চায় না—শুধু নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা কতগুলি প্রত্যহ।

বাস থেকে নেমে স্বচ্ছন্দে লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে গেল অমিয়। বাজারের পথ ছেড়ে নিজেদের গলিতে ঢুকতে সে এতটুকু উদাসীন হল না। ফেরার পথে একই দোকানির কাছে ডিম কেনা তার প্রত্যহের অভ্যাস, তাকে ফাঁকি দিতে আজ সে ডান দিক ঘেঁষে গেল। সহজেই পেরিয়ে গেল চায়ের দোকানটা।

'কে যেন মারা গেল ?'

অমিয় চোখ তুলল। বাড়িঅলা ভবেনবাবু, তাস পিটতে চলেছেন। ভাল লাগল না। তবু সহজে এড়ানোর জন্য বলল, 'কনক।'

'কে কনক ! সেই লম্বা মাথা, রোগাটে কালো ছোকরা ?'

বর্ণনা মেলে না। কনক মোটেই লম্বা ছিল না। তার গড়ন মাঝারি, মোটা বা রোগা কোনটিতেই পড়ত না সে; রঙ ফরসা-ঘেঁষা ছিল বলেই মৃত্যুর আগে কয়েকটা দিন ওকে বড় বেশি উজ্জ্বল দেখাত। লম্বা, রোগা, কালো এ-সব কিছুই ছিল না সে। ভবেনকে কাটাবার জন্যে অমিয় তবু ঘাড় নাড়ল। তারপর সত্যি সত্যিই পাশ কাটিয়ে গেল। আরো কয়েক পা এগিয়ে সে বাড়ির দরজায় পৌঁছুলো।

ঘরের আলো নেবানো, জানলাটা খোলা। জানলার গরাদে মুখ রেখে বসেছিল রেখা। অমিয়কে দেখে আলো জ্বালল।

'শেষ হয়ে গেল সব?' দরজা খুলেই রেখা বলল। তারপর যেমন-তেমন করে একটু দুঃখ মিশিয়ে বলল, 'এত দেরি হল কাজ মিটতে!'

'একেবারেই মিটিয়ে এলাম—'

মমতাহীন, নির্বিকার চোখে রেখার মুখ দেখল অমিয়—হঠাৎই আকাশ দেখার মতো করে, মিটিয়ে এলাম কথাটা প্রতিধ্বনিত হল ওর বুকের ভিতর। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ও বাথরুমে যাবার কথা ভাবল।

রেখা বলল, 'দাঁড়াও।'

'কেন!'

'শশ্মান থেকে ফিরছ, তেতো খেতে হয়। মড়ার মায়া নিয়ে ঘরে ঢুকতে নেই—'

অমিয় আপত্তি করল না। দাঁতের আগায় একটু নিমপাতা কেটে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'মায়া কি জিনিস?'

'আমিই কি ছাই জানি!' পর্দার ওপার থেকে রেখার গলা শুনল, 'সবাই যা করে আমিও তাই করলাম।'

অমিয় হাসল, কিছুটা গলা পরিষ্কার করে, বোধহয় সে স্বাভাবিক

হয়ে আসছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'সবাই যা করে!' একটু থামল। 'কনককে তো তুমি চিনতে। চিনতে না?'

রেখা বোধহয় এ-ঘরেই আসছিল। দরজার পর্দায় অমিয় ওর ছায়াটাকে থেমে পড়তে দেখল। পর্দার নিচে দিয়ে যে-টুকু মেঝে দেখা যায় দেখল সমানভাবে পায়ের পাতা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে রেখা। চমৎকার সাদা পা। গেঞ্জি আর ট্রাউজার্সটা খুলে দরজার কোণে ছুঁড়ে দিয়ে ও বলল, 'আমার চেয়ে বেশি চিনতে—একসময় ওকে ছাড়া আমাদের কাউকেই তুমি চিনতে না! চিনতে কি?'

বলতে বলতে বাথরুমে গেল।

চৌবাচ্চার জলে অনেকক্ষণ ধরে চান করল অমিয়। আজ তার হাতে প্রচুর সময়। মরে গিয়ে সময়ের দাম কমিয়ে দিয়েছে কনক। একদা'র বন্ধু, গতকাল পর্যন্তও যার মাথায়, কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়েছে, সেই কনক আজ, এখন কোথায়!

খুব শিথিলভাবে অমিয় কনক সম্পর্কে তার অনুভূতিগুলো প্রখর করার চেষ্টা করল, সবকিছু থেকে আলাদা করে নিয়ে ভাবল কনককে, কিন্তু ভিতর থেকে তেমন সাড়া পেল না। দুঃখ বা বেদনাবোধ, শোক—এইসব ব্যাপার থেকে সে কোন সার সংগ্রহ করতে পারল না। যতবারই কনককে মনে করার চেষ্টা করল, দেখল রেখা জুড়ে আছে তার সমস্ত মন—রেখা, তার স্ত্রী, পাঁচ মাস ধরে জঠরে যে তার সন্তানের লালন পালন করছে।

বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল অমিয়। কোন মায়া নয়; শ্মশান থেকে চিট ধরার মতো ক্লিন্ন একটা অনুভূতি বয়ে এনেছিল সর্বাঙ্গে, সেটা গেছে অনুভব করে নিজেকে অনেক পবিত্র লাগছিল। আজ সে অফিসে যায় নি। হাসপাতাল থেকে শ্মশান এই নিয়েই কেটেছে সারাক্ষণ, একটা জ্যান্ত মৃত্যুর আবহাওয়া! সত্যি সত্যিই বড় বেশি দিন ধরে তাদের

অধিকার করে ছিল কনক। বন্ধুর জন্যে যা করার—কর্তব্য যা-কিছু, সবই করেছে অমিয়।. এখন মুক্তি। কাল রবিবার। পরশু থেকে সে আবার নিয়মিত অফিস যাবে। আড্ডার প্রশ্ন ওঠে না এখন, সত্যি বলতে, আড্ডাও কি আর থাকবে! কনক নেই, এখন আর আড্ডা থাকার কথা নয়। এবার ফুটবলের মরশুম পড়ার আগেই রোগে পড়ল কনক, একদিনও খেলা দেখা হয় নি। এরপর মাঠে যাওয়ার ভূত আপনা-আপনিই নেমে পড়বে ঘাড় থেকে। পরিবর্তে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে অমিয়। রেখা আর সে—দু'জনে বেড়াতে বেরুতে পারে; বাচ্চা হলে বা আব কিছুদিন পর থেকেই তো ন্যাজেগোবরে হয়ে পড়বে রেখা! তার আগে যে ক'টা দিন আছে, পুরনো স্বাদগুলো খুঁটে নেবে।

এইসব ভাবনার মধ্যেই ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে অমিয় খবরের কাগজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আটটি পৃষ্ঠা পুরো পড়ে ফেলল। ঘড়িতে তখন দশটা। স্নায়ুময় অবসাদ, চোখ টাটিয়ে ওঠে—রেখা বিছানা করে মশারি ফেলছে দেখতে পেল, হাই উঠল পর পর, গলির দিকে একটা জোরালো আলো নিবে গেল টপ করে। আজ রাতে সে অনেকক্ষণ ঘুমোবে, অমিয় ভাবল, কাল সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে মৃত কনকের বয়স ততক্ষণে একদিন পুরে গেছে। পরশু দু' দিন। তারপর তিন দিন। মাঝে মাঝে মনে পড়বে কনককে। খুব কাছের মানুষ ছিল সে। 'কবে থেকে দেখছি তোমরা হরিহর আত্মা', বসুধা একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা চাও বাবা, তোমরা চাইলেই ও বেঁচে উঠবে।' কি সব ছেঁদো কথাবার্তার ওপর মানুষের নির্ভর! হরিহরদের একজন এখন চান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে দিনান্তে খবরের কাগজ পড়ছে। রাজ্যপাট একইরকম থাকল—মাঝখান থেকে দিব্যি চলে গেল কনক!

'শেষ পর্যন্ত অসুখটা কি হয়েছিল? লিউকোমিয়া?'

সাবধানে মশারি তুলে খাট থেকে নামবার সময় রেখার জানু পর্যন্ত শাড়ি উঠে যায়, মৃদু রোম সমেত ধবধবে পায়ের গোছ বেরিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে অমিয় বলল, 'তাই-ই হবে। আর তো কিছু জানা যায় নি।'

'কি বিশ্রী রোগ! আচ্ছা—', খেতে বসে বলল রেখা, 'ও তোমাদের আগে কিছু বলে নি? অসুখটা আসছে যে টের পায় নি!'

'কি করে পাবে!' রুচি পাচ্ছিল না, গ্লাশ শূন্য করে জল খেল অমিয়। উঠতে উঠতে বলল, 'শরীরের ভেতর রক্ত। রক্তের রঙ পাল্‌টে যাচ্ছে কখন, কি কবে, ও কি করে বুঝবে!'

'কি সব রোগ! আমাদেরও যে হবে না কি করে বুঝব!'

ঠিক প্রশ্ন নয়, বিস্ময়ও নয়; দু'য়ের মাঝখানে কোন এক স্তরে কথাগুলো আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল রেখা। নিজের সঙ্গে নিজের রফা করার মতো।

বাড়িতে আয়েস করে খাবার জন্য দামী সিগারেট রাখে অমিয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকার চেষ্টা করল। রেখার শেষের কথাগুলো পরিষ্কার কানে যায় নি তার। তবু মনে হল, যা'ই বলে থাকুক রেখা, ঠিক উত্তর যেন সে চায় নি। কনক চলে গেল—বলতে গেলে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুরু করে দিয়েছিল কনকই, তার জন্য গভীর কোন বিষাদ এখন সে বুক হাতড়েও খুঁজে পাচ্ছে না। তা হলে থাক অমিয়, থাক, তার সম্পর্কে অন্য আলোচনাও থাক। কি লাভ! সে তার, বা তাদের, বন্ধুই ছিল, আর কিছু নয়। খামোকা তাকে নিয়ে আর কাটাছেঁড়া কেন!

রাত এগারোটায় অমিয় হাই তুলল। একই ধরনের হাই, হাসপাতালের কেবিনের বাইরে আচ্ছন্নের মতো বসে গত কয়েকদিন

ধরে যে-রকম হাই উঠত। এতক্ষণ ছিল না, কিন্তু এখন, আলো নেবানো সত্ত্বেও, মশারির ভিতর শুয়ে খোলা চোখে সে একরকম মিহি আলো চুপচাপ ছড়িয়ে পড়তে দেখল। রেখার পাশে শুয়ে রেখার গা থেকে-একরকম গন্ধ পেল, চেনা গন্ধ। গন্ধটা নাকের সামনে অদৃশ্য হাতের রুমালের মতো নড়তে থাকল। ঘুম এল না।

'তুমি কি ঘুমোলে ?'

'না—।' চিত হয়ে শুয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিল রেখা, 'ঘুম আসছে না।'

'কেন !'

আরো একটা আলো নিবে গেল কোথাও। মশারির ভিতর এখন থমথমে অন্ধকার। রেখা কোন জবাব দিল না।

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর বুক ছুঁলো অমিয়। বুক থেকে হাত তুলে গলায় ছোঁয়াল—ঘাম। তারপর অন্ধকারে মিশে যাওয়া হাত তুলে অমিয় রেখার নাকমুখের ওপর রাখল।

'কি করছ ! দম বন্ধ হয়ে যাবে না !'

শব্দ করে হাসল অমিয়। হাতটা সরিয়ে নিল।

'কি ভাবছ ?'

'কি আর ভাবব !'

সেফের মাথায় টাইমপিস্‌টা টিক টিক করে চলেছে। চোখের ওপর অন্ধকাবে খানিক সময় পার করে দিল অমিয়।

'কনক মারা গেল, তোমার খারাপ লাগছে না ? একসময় তো ওকে ভালবাসতে তুমি !'

বাতাসহীন গরমে অমিয়র কপালের ঘাম চুঁয়ে চুঁয়ে গলার কাছে নেমে এল। অন্ধকারেই পাশ ফিরে রেখা ওর বুকের ঘন রোম আঁকড়ে ধরে বলল, 'আমি বেঁচে গেছি। যদি ওর সঙ্গেই আমার

একটা কিছু হত !'

'নিমপাতা ছোঁয়ালে, তুমি নিজেই মায়া কাটাতে পারলে না !'

গলায় কাশি উঠে আসতে আস্তে ঢোক গিলে নিল অমিয়। রেখার নিঃশ্বাস বুকের ঘামের ওপর পড়ে বিজবিজ করতে থাকল। অসংখ্য অদৃশ্য পোকা এইসময় অমিয়র বুক বেয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেয়।

'তুমি স্বার্থপর, তাই অমন করে ভাবছ।' একটু থেমে বলল অমিয়, 'ভেবে দেখ, রোগটা তো আমারও হতে পারত। এইরকম-ভাবেই হুট করে চলে যাওয়া যেত—'

কথাটা আবছাভাবে শেষ করল অমিয়। নিঃশ্বাস বন্ধ। অন্ধকারেই ও বুঝতে পারল রেখা নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। অমিয়কে তখনো ছুঁয়ে আছে না-ছোঁয়ার মতো করে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে যেন। অমিয়র বুকের ওপর দিয়ে অন্ধকার গড়িয়ে গেল।

'এমনভাবে যে-কেউই তো যেতে পারে। হঠাৎ। তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছ ? যদি আমি মরতাম ! কে বলতে পারে !'

'তুমি !' চেষ্টাকৃত গলায় হাসল অমিয়, 'তা হলে অমিয় ব্যানার্জী বিপত্নীক হয়ে পড়ত। কিন্তু কনক বা অমিয় দু' জনেই থাকত। তা হল না। একজন চলে গেল !'

ওদিক থেকে কোন জবাব এল না। পাশ ফিরে শুলো রেখা। সম্ভবত ক্ষুণ্ণ।

কথা হারিয়ে অমিয় কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকল। নিবাতাস ঘরে গা দিয়ে ঘাম ছুটছে তির্‌তির্ করে। আজ তার ঘুমোবার কথা, ঘুমের সমস্ত উপসর্গ জড়ো হয়েছিল শরীরে, অথচ ঘুম আসছে না। পরিবর্তে কনকের মুখই বার বার ভেসে উঠছে চোখে। যতকাল ছিল আমোদে ছিল ; আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে

পৃথিবীর কোন ক্ষতি হত না। তবু সে গেল, চলে গেল!' আলো

টুকটাক অনেক কথাই মনে পড়ে। কাছের দূরের নানা রকম ঘটনা। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানে অমিয়।

'রেখা একদিনও এল না!'' হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে একদিন বলেছিল। আক্ষেপ বেজেছিল কনকের গলায়, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষ যে-রকম গলায় কথা বলে।

অমিয় জবাব দিতে পারে নি।

'বড় ভাল লাগতো এলে—', রুগ্ন হাতটা কপালে বোলাতে বোলাতে বলেছিল কনক। শূন্য কপাল, সরু সরু আঙুলের চলাফেরায় আরো রুগ্ন লেগেছিল তখন।

'আনব। খুব শীগগিরই নিয়ে আসব একদিন।'

'না, থাক।' জানলার পর্দায় চোখ রেখে বলেছিল কনক, 'কি হবে এসে!'

কনককে দেখার জন্য সেদিন একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছিল অমিয়। তখনো বেলা যায় নি। রোদ পড়ে যাওয়া বিকেলের আলো ক্রমশ ঘন হতে শুরু করেছে। পর্দার ওপারে যে-টুকু আকাশ দেখা যায় সেদিকে তাকিয়ে কনক বলেছিল, 'তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া। একা থাকতে ভাল লাগছে।'

রহস্যময়! হয়তো। খটকা বুকে নিয়ে কেবিনের বাইরে এসে অমিয় বুলাকে পেল। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

'দাদার মনটা ভাল নেই মনে হল।' বুলা বলল, 'কি হয়েছে বলুন তো?'

'জানি না।'

সারাদিনের অপরিসীম ক্লান্তির পর ঘুম-না-আসা তন্দ্রার আচ্ছন্নতায় বুকের কোথাও পর পর ঘড়ির শব্দ ও দাঁড় টানার ছলছল শব্দ শুনতে পায় অমিয়। চিত হয়ে শুয়ে মনে হয় দম

একটা আসছে ; অবসরবে।

'হাড়-হাড়, রুগ্ন হয়ে অনেক ভাবল নিখিল। ঠিক কে হতে
.য় বা জেগে, ঠিক 'ল না।

অমিয় পাশ ফিকেছু বলেছে ?'

'রেখা ?' .রছিল বিলিংয়ের প্রফুল্ল। হেসে বলল, 'যে নাম বলেনি
'কি ;' . কেন বলবে দাদা!' তারপর, নিখিলকে ভাববার
'কনকেয়ে, ফাজিল গলায় বলল, 'গলা শুনে মনে হল ইয়াং।
'কেন কোন প্রাইভেট ব্যাপার!'

'বজবাব দিল না নিখিল। প্রফুল্লর মুখের দিকে খানিক অন্যমনস্ক
হকয়ে থেকে মাথাটা নামিয়ে আনল টেবিলে। প্রাইভেট ব্যাপার
'প্রাইভেট ব্যাপার, আটাকলের চাকার মতো কথাটা ভনভন
ের ঘুরতে থাকল মাথায়।

দিশে টেবিলে অনেক কাজ। গোটা চারেক ফিতে-বাঁধা ফাইল আর
টাইকাগজের স্তূপ ; ঘৃণাভরে তু'একটা উল্টে-পাল্টে দেখল সে—কিছুটা
করসময় গেল। টেলিফোন আর কাজ, তুটোর ভাবনাই,তাকে বিমূঢ়
করে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর, হঠাৎই সব কাগজপত্র তুলে
সেকশন-ইনচার্জের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এইসব আমার টেবিলে পাঠিয়েছেন কেন! কে করবে ?'

'কেন! ওগুলো তো আপনারই কাজ! তিনদিন আসেন নি
বলেই—'

নিখিল ভুরু কোঁচকাল। বিরক্ত।

'যদি একমাস না আসি, তাহলেও সব টেবিলে জমা করবেন!
কি.ধরনের সিস্টেম আপনাদের! হোপলেস্!'

মুকুন্দ সান্যাল নরম লোক যে-কোন কারণেই হোক নিখিলকে
পছন্দ করে। কথাগুলো হজম করে নিল নির্বিবাদে। সামনের
চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

'বসে কি হবে !'

'আহা, রাগ করছেন কেন ! বসুনই না—'

অনিচ্ছায় বসল নিখিল। সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল মুকুন্দ।

'কি হয়েছিল দু'দিন ?'

'কিছু নয়। এমনিই—।' পরে বলল, 'আমার এক বন্ধু মারা গেছে।'

'সত্যি !' চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছড়িয়ে দিল মুকুন্দ, 'ইস্ ! কে বলুন তো ?'

'কনক। আপনি চিনবেন না—'

'নামটা চেনা চেনা লাগছে। হঠাৎই গেল ?'

'হঠাৎ কিছু না। ভুগছিল, খুব খারাপ অসুখ·· ', বলতে বলতে থামল নিখিল, তেরছা করে তাকাল মুকুন্দর দিকে।

'এত কথা জানতে চাইছেন কেন ! বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'না, না, সে-সব কিছু নয়।' অপ্রতিভ হাসল মুকুন্দ। 'কাগজপত্র আপাতত আমার টেবিলে থাক। আজ আপনার মেজাজ খারাপ, রেস্ট নিন।'

এমনিতে খারাপ লাগে না। তবু এখন কেমন ধূর্ত মনে হল মুকুন্দকে—একটু বসিং করে নিল যেন।

ফোনের কথাটা ভুলতে পারল না নিখিল। যতটা সম্ভব একাগ্র হবার চেষ্টা করল, যদি কাউকে মনে পড়ে।

না, তেমন কেউই নেই। খুব কম মহিলার সঙ্গেই তার জানাশোনা। তাদের মধ্যেও এমন কেউ নেই যে তাকে ডাকতে পারে ফোনে। যাদবপুরের দিকে থাকে এক পিসতুতো দিদি, মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিত ফোনে। ছেলের চাকরির জন্যে কিছু-দিন খুব ঘন ঘন ফোন করত। দুর্গাপুরে ছেলের চাকরি হবার পর

একটা খবর দিয়েছিল। সেই শেষ। পুরনো ব্যাপার। কি যেন নাম ছিল ছেলেটির! অশোক? সম্ভবত অশোক। আর কাউকে মনে পড়ে না।

অশান্তি নিয়ে টিফিনের আগেই উঠে পড়ল নিখিল। অপারেটর বসে দোতলায়, তাকে গিয়ে ধরল।

'আমার একটা ফোন এসেছিল। কে করেছিল বলতে পারেন?'

খুব স্বচ্ছন্দ গলায় মেয়েটি বলল, 'না'; তারপর লাইনে কথা বলতে শুরু করল।

নিখিল তবু দাঁড়িয়ে থাকল। কথা শেষ করে হাসল মেয়েটি।

'লাইন এলে তো দিয়েই দিই। ডিপার্টমেণ্টে বলতে পারবে, সেখানে জিজ্ঞেস করুন।' বলেই পটাপট লাইন খুলতে শুরু করল। অপেক্ষা না করে দ্রুত রাস্তায় নেমে এল নিখিল।

টিফিনের সময় পি-বি-এক্স বন্ধ থাকবে। তার মানে এখন ঘণ্টা খানেকের জন্য নিশ্চিন্ত। এই এক ঘণ্টায় চটপট কাজগুলো সেরে নিতে হবে। পকেট থেকে খামসুদ্ধ দরখাস্তের ফর্মটা হাতে নিয়ে জি. পি. ও-তে চলে এল নিখিল; পোস্টাল অর্ডার কেনার জন্যে লাইনে দাঁড়াল।

বেশ ভিড়। কাউণ্টারের লোকটি হাত চালাচ্ছে নিজের মতো করে; পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজনকেও নড়তে দেখল না লাইন থেকে। এইভাবে চললে ঘণ্টা দেড়েকের আগে সে ফিরতে পারবে না অফিসে। যে ফোন করেছিল ইতিমধ্যে সে যদি আবার ফোন করে! পোষাকের আড়ালে কুলকুল করে ঘামতে থাকল নিখিল।

আবার অফিসে ফিরতে সওয়া দুটো বেজে গেল। মাঝ পথে

কোন জায়গায় লিফ্‌ট্‌ আঁটকে আছে, অপেক্ষা না করে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এল তিনতলায়। জিজ্ঞেস করতে প্রফুল্ল বলল, 'আসে নি।'

নিখিল হতাশই হল। বরং ভাল হত যদি এসে শুনত ফোন এসেছিল, সেই একই গলা, নাম বলে নি। সে কি এইরকমই কিছু আশা করে নি!

চিন্তা গেল না। সীটে বসে তবু কিছুটা ধাতস্থ হয়ে নিল নিখিল। আত্মস্থতার মধ্যেই টের পেল বুক থেকে কঠিন ভারের মতো কিছু একটা নেমে যাচ্ছে। নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে এখন বেশ ভাল লাগছে। কিংবা, ধাতস্থ হবার পর ভাবল, এমনও হতে পারে, টেলিফোনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানানো, সুযোগ বুঝে প্রফুল্ল তার সঙ্গে একটু তামাশা করে নিল। এ-রকম তো কতই হয়!

খুব অলসভাবে সময় কেটে যেতে লাগল নিখিলের। পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে সকলে—আশেপাশে ব্যস্ততা। একা, কর্মহীন, তার সময় কাটতে লাগল ঢিকুতে ঢিকুতে। ঘড়িতে তিনটে বাজল, সওয়া তিনটের মধ্যে নিয়মমাফিক চা দিয়ে গেল বেয়ারা। অদূরে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে কুমীরের মতো একাগ্র চিন্তায় ভাসতে থাকল সে। নাঃ, এল না।

খানিক আগেও চনমনে রোদ ছিল। দেয়ালে ছায়া ঘনাতে দেখে বুঝল মেঘ করেছে। ক'দিন খুব গরম যাচ্ছে, বৃষ্টি হলেও হতে পারে। এই বদ্ধ গুমোট ভাবটা সত্যিই কাটা দরকার।

চা'টা কোনরকমে শেষ করে বাইরে এল নিখিল। বারান্দায়। এখানে দাঁড়ালে গঙ্গা দেখা যায়। মরা রোদে নৈরাশ্যের ভাব; এইরকম বিকেলে হঠাৎই মন খারাপ হয়ে পড়ে।

জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল নিখিল। একটা বড় জাহাজ চোখে পড়ল, রেখার আঁকিবুকি দেখে মনে

হয় জাপানী। একটা মোটর লঞ্চ লেজের ঘায়ে জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যাচ্ছে—ব্রীজের নিচে পর্যন্ত নিখিল লঞ্চটাকে ধাওয়া করল। অতর্কিতে হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে। নদীর বুক ছুঁয়ে উঠে আসার জন্যেই সম্ভবত বাষ্পাচ্ছন্ন ও ভিজে। ঘাড়ে, মুখে ঝাপ্টা লাগতে আদ্র্রতা টের পেল নিখিল। বুকের মধ্যে মৃদু কষ্ট—চিন্তার ভিতর সব কেমন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক বোঝা যায় না কেন এই অস্বস্তি। সে কি সত্যি সত্যিই কারও অপেক্ষায় ছিল! না কি সবকিছুর শুরু সেই শূন্যতায়, কনকের মৃত্যুর পর ক্রমাগত তিনদিন যা তাকে, নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল!

আবার ভিড়ের মধ্যে ফিরে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিখিল। একটু অপেক্ষা করে রিসিভারটা তুলে নিল হাতে।

প্রফুল্ল বলল, 'পাগ্লা হয়ে গেলেন নাকি দাদা ?'

'কেন !'

'ফোন এলে ডাকতুম···'

মুখে একটা বাজে খিস্তি এসে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে লাইন চাইল—লঞ্চটা ব্রীজ বরাবর পৌছবার সময়েই ফোন করার কথাটা প্রথম মনে হয়েছিল তার। লাইন পেয়ে অমিয়কে খুঁজল।

এক হাত ঘুরে ওপাশে অমিয়র সাড়া পেল।

'নিখিল বলছি। খবর কি তোর ?'

'কি আর তেমন···চলে যাচ্ছে। তুই অফিসে আসছিস না কেন ?'

'ফোন করেছিলি ?'

'না, শ্যামল বলল। অসুখ-টসুখ নয় তো ?'

'না, না, ভাল লাগছিল না।'

নিখিল থামল। এই মুহূর্তে অমিয়কে ফোন করার একটা নিশ্চিত উদ্দেশ্য আছে, অথচ কথাটা পরিষ্কার করে বলতে অসুবিধে হচ্ছে। কানে রিসিভার লাগিয়ে অমিয়র পরের কথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল নিখিল।

'কাল আমরা কনকের ওখানে গিয়েছিলাম।' অমিয় বলল, 'তুই থাকলে ভাল হত।'

'হ্যাঁ। কেমন আছে ওরা?'

'কেমন আর! বুঝতেই পারছিস···'

একটু চুপ করে থাকল অমিয়। তারপর বলল, 'মাসীমা বলছিলেন তোর কথা। তুই যাচ্ছিস না কেন?'

'ভাল লাগে না···'

'যাস একবার। আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি, পরে দেখা করব···'

'হ্যালো···হ্যালো···', অমিয় দূরে যেতে প্রায় চীৎকার করে উঠল নিখিল, 'হ্যালো, অমিয়···'

'কি বলছিস আবার?'

'রেখার খবর কি? কেমন আছে?'

'মোটামুটি। ওর জন্যেই বাড়ি ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি—'

'আচ্ছা,' ভেবে বলল নিখিল, 'রেখা কি ফোন করেছিল আমাকে?'

'রেখা! হঠাৎ?'

রিসিভারটা অল্প কেঁপে গেল হাতের মুঠোয়। প্রায় জ্বরের ঘোরে বলল নিখিল, 'একটি মেয়ে ফোনে আমাকে খুঁজছে। ভাবলাম, রেখা হয়তো।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না অমিয়। খানিক অপেক্ষার পর থতমত গম্ভীর গলায় বলল, 'তোরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস!'

ফোন ছেড়ে দিল। রিসিভার নামিয়ে রাখার গাঢ় ধাতব শব্দটা

অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে।

ঠিক এভাবে কথাটা বলতে চায় নি সে। তবু বলা হল। ভেবে দেখলে তার কথায় অসৌজন্য প্রকাশ পায় নি—নিতান্তই কৌতূহল মেটানোর জন্য একটা প্রশ্ন করেছিল, অমিয়র ক্ষুব্ধ হবার মতো কারণ ঘটে নি। যে যা'ই বলুক, সে অমিয়র প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কোনদিন ছিল না। রেখা সম্পর্কে দুর্বলতা ? অসম্ভব। এ-রকম করে কোনদিন কিছু ভাবে নি। তা হলে এমন হল কেন !

হয়তো একটু বেশি সময়ই নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল নিখিল। কতোক্ষণ, ঠিক খেয়াল ছিল না।

চমক ভাঙল বেয়ারার ডাকে। এনকোয়ারিতে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন, ডাকছেন। জবাব না পেয়ে বলল, 'ডেকে আনব ?'

'নাম বলে নি ?'

'না। দেখে মনে হয় বিধবা। ডাকব ?'

'না, থাক।'

আশেপাশে খুব সতর্কভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেয়ারাকে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিও।'

অভ্যাসে ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল হল আজ সারাদিন সে ড্রয়ার খোলে নি। কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। বারোটা থেকে সাড়ে চারটে কিছু কম সময় নয়। সমস্ত সময়টুকুই সে কাটিয়েছে স্তব্ধ সময়হীনতার মধ্যে, একরকম অন্যমনস্কতা নিয়ে। ক্ষতের খসে-পড়া চামড়ার মতো মাঝখানে অমিয়র সঙ্গে কথাবার্তা—ঘটনাটা ঘটে গেলেও এখন যা অবিশ্বাস্য লাগছে। এখন, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসতে আসতে, নিখিল শুধু ভাবল কেউ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। কে ? বিশ্বাস হল না।

নিচে এসে দেখল বুলা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিশেহারা চোখে

তাকিয়েছিল সিঁড়ির দিকে, নিখিলকে দেখে এগিয়ে এল।

'আরে, তুমি!'

শেষের কথাটা খুব আস্তে, হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়ার মতো করে উচ্চারণ করল নিখিল। আশেপাশে আরো কেউ কেউ বসে আছে, বিশেষত ঈষৎ সন্দিগ্ধ চোখে তাদের লক্ষ্য করছে রিসেপসনিস্ট মেয়েটি। খুব কম মহিলার সঙ্গে জানাশোনা বলেই এ-ব্যাপারে একটু সঙ্কোচ লাগল নিখিলের, এমনভাবে কথাটা বলল যাতে কেউ শুনতে না পায়।

বুলা এগিয়ে এল কাছে। নিঃশ্বাস চাপতে চাপতে বলল, 'বাব্বা, তিনবার ফোন করেছি আপনাকে!'

'তা হলে তুমিই—!'

কেন বুলার কথাটা আগে মনে হয় নি ভেবে আক্ষেপ হল নিখিলের। তারপরেই তাড়াহুড়ো করে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে! চল, বেরিয়ে পড়ি।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

দেয়ালের ঘড়িটার দিকে বুলাকে তাকাতে দেখে নিখিল বলল, 'আমার ছুটি হয়ে গেছে। এসো, বলছি।'

রাস্তায় নেমে অনেকটা হাল্‌কা লাগল নিজেকে। পিছনে বুলা।

অফিস ছুটি হতে এখনো কিছু দেরি আছে, জ্যাম নেই, এখনো খুব সাবলীলভাবে হাঁটাচলা করছে মানুষ। সামনে মসৃণ রাস্তাটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই পথ ধরে অফিস ছুটির আগেই কতদিন হাইকোর্টের সামনে দিয়ে চমৎকার চলে যাওয়া যেত খেলার মাঠে। মনে পড়ায় বুকের ভিতরটা অল্প মুচড়ে উঠল নিখিলের। নিজের ভিতরেই তোলপাড়-করা একরকম অসহযোগ ক'দিন ধরে টের পাচ্ছে। এই মুহূর্তেও হঠাৎ অসহায় লাগল

নিজেকে। কনক থাকলে বুলা নিশ্চিত এতদূর ছুটে আসত না। কি প্রয়োজন বুলার তার সঙ্গে!

সোজাসুজি বুলার মুখের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ হল নিখিলের। সঙ্গে ডাকার মতো করে বুলার জন্য পাশে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সামনে হাঁটতে লাগল। খুব সাধারণ একটা শাড়ি বুলার গায়ে, সাদা ব্লাউজ, পায়ে জঞ্জাল খুঁজে বের করে আনা রবারের চটি। বুলাকে কেন বিধবা মনে হবে ঠিক বুঝতে পারল না।

'অফিসে এসেছি জানলে কি করে?' আরো খানিকটা হেঁটে এসে প্রথম কথা বলল নিখিল।

'বাড়িতে গিয়েছিলাম।' বুলার গলায় জড়তা। একটু কাশল, সহজ হবার চেষ্টা করল। 'অফিসে বলল অসুস্থ, তাই বাড়িতেই গেলাম। শুনলাম অফিসে এসেছেন—'

'অনেক ছুটোছুটি করেছ তা হলে—!' নিখিল বলল, 'অসুস্থ কিছু নয়। ভাল লাগছিল না, বুঝতেই পারছ—'

বুলা বলল, 'আপনার অফিসটা বেশ। দাদার অফিসটা বোধহয় ওইদিকে ছিল...'

পুবমুখো হাঁটতে হাঁটতে উত্তরদিকে তাকাল বুলা। নিখিল জবাব দিল না।

সত্যি বলতে, বুলার সান্নিধ্যে সে একরকম অস্বস্তি বোধ করছিল। এই পরিবেশে কোন মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি সে হেঁটেছে কিনা সন্দেহ। ক্রমশ নরম হয়ে আসা রোদের আভা ছড়িয়ে আছে উঁচু বাড়িগুলোর মাথায়, হাওয়া বইছে এলোমেলো, চলমান প্রতিটি মুখই অপরিচিত—এর মধ্যে যতবারই সে বুলাকে একান্ত করে ভাবল, ততবারই মনে পড়ল কনকের মুখ—মৃত ও অক্ষম, ঝুলে-পড়া জিবের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে একটা জীবন্ত মশা।

এ-সবের কি মানে হয়! নিখিল ভাবল। বুলা সম্পর্কে আলাদা করে চিন্তা করার সত্যিই কিছু আছে নাকি! কনকের বোন, খুব কম করেও আট দশ বছর দেখছে তাকে, প্রায় ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়ের মতন—বুলা সম্পর্কে এই মুহূর্তে অন্য কোন ভাবনা প্রশ্রয় দেয়া অন্যায় ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে হেঁটে চলাতেও কোন আকস্মিকতা নেই। আজ সারাদিন ধরে বুলা তাকে খুঁজেছে ফোনে, ফোনে না পেয়ে বাড়িতে গেছে, বাড়িতে না পেয়ে এসেছে অফিসে। নিশ্চিত নিখিলকে তার জরুরী দরকার। এমন কোন কথাবার্তা আছে যার জন্য সামান্য অপেক্ষাও সহ্য হয় নি বুলার—ভাবতে ভাবতে বুক ভরে উঠল নিখিলের।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট পেরিয়ে এসে নিখিল দাঁড়াল।

'তোমাকে অনেকটা হাঁটিয়ে আনলাম। খারাপ লাগছে?'

আস্তে ঘাড় নাড়ল বুলা। অশৌচের সময় বলেই সম্ভবত, অসম্ভব ক্লান্ত, রুক্ষ ও নিরক্ত লাগছিল বুলাকে। দূরে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'কোথাও না।' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল নিখিল। নিচু গলায়, প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, 'ক'টা দিনে কেমন বদলে গেলাম—'

বলতে বলতে থামল। এ-সব কথা বুলাকে বলে কি লাভ! বুলা তাকে বুঝবে না ; বস্তুত, বুঝতে পারার তেমন কোন কারণই নেই। যতদিন কনক ছিল—ওরা ছিল ; পল্‌কা, ভারা-ভাঙা সেতুর মতো এখনো একটা যোগাযোগ রেখে চলেছে কনক। যতই উত্তপ্ত হোক, স্মৃতি মাত্র নির্ভর করে পারাপারের চেষ্টা বৃথা। আজ বলে নয়, আর কোনদিনই কি সম্ভব হবে!

নিজেকে পাশ কাটিয়ে পর পর কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এল নিখিল।

'তোমাদের কি খবর? আমি দু'দিন যেতে পারি নি। এমনিই, কোন কারণ ছিল না।' অল্প থামল। 'তুমি কি কিছু বলবে?'

একটু ভাবল যেন বুলা। কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'আমার একটা চাকরি দরকার, নিখিলদা।'

'হঠাৎ!'

অভ্যাসেই বলেছিল। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল নিখিল, এ-ভাবে বলা ঠিক হয় নি। বুলা কিছু ভাবতে পারে। সামাল দেবার মতো একটা কথার জন্য ও ছটফট করল; কিন্তু জুতসই কোন প্রসঙ্গ মনে এল না।

ওরা যেখান দিয়ে হাঁটছিল, সেখানে, ফুটপাথের আশপাশ থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরুনোর মতো হঠাৎই মানুষ ও গাড়ির শব্দ সচকিত করে তুলল। সম্ভবত অফিস ছুটির সময় পেরিয়ে গেছে। প্রায় গা-ঘেঁষে যেতে যেতে জন চারেকের একটি দল পিছন ফিরে তাকাল তাদের দিকে। না, তাদের দেখে অন্য কিছু ভেবে নেয়ার কারণ নেই। সম্পূর্ণ প্রেমহীন এই ভ্রমণ। বাড়ি ফিরে বিছানায় গড়াতে পারলেই তার এখন সবচেয়ে ভাল লাগত। আর বুলা—বুলার একটা চাকরি দরকার।

ব্যস্ত ও গতানুগতিক কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকে অসম্ভব নির্জন লাগল নিখিলের। সেই একই বিচ্ছিন্নতার বোধে আবার সে আক্রান্ত হল, গত ক'দিন ধরে ক্রমাগত যা তাকে ঘুমের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুগতের মতো রাস্তা পেরুলো বুলা। কিছুক্ষণ আগেও একটা উদ্বেগ ছায়া ফেলেছিল তার মুখে, এখন সে-সব কিছু নেই। অন্যমনস্কতায় দৃঢ় মুখ, বুলা হাঁটছে, দেখে মনে হয় আরো অনেকক্ষণ একইভাবে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যেতে তার কোন অসুবিধে হবে না।

সামনে ময়দান। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিখিল

বলল, 'মাঠে বসবে ? তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ !'

একটু কাঁপল বুলা, ইতস্তত করল অল্প। আশেপাশে তাকিয়ে বলল, 'বসি। আপনি আমায় বাসে তুলে দেবেন।'

বসার পর নিজেকে খানিকটা সহজ লাগল নিখিলের। দূরে খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের কি খুব অসুবিধে হচ্ছে, বুলা ?'

হাঁটুর ওপর গলা নামিয়ে বসে এক হাতে ঘাস খুঁটছিল বুলা। একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল।

'আপনি তো সবই জানেন—।' সময় নিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বুলা বলল, 'দু'দিনেই বাবা কেমন বদলে গেছেন ! সারাক্ষণ গালমন্দ করছেন সকলকে। দাদার মৃত্যুর জন্যে নাকি আমরাই দায়ী—আমরা সকলে !'

কথাটা আচমকা শেষ করে গম্ভীর হয়ে গেল বুলা।

নিখিল অপ্রতিভ বোধ করল। ঠিক এই কথাগুলোর জন্যে সে তৈরি ছিল না।

'সবই টেম্পোরারী।' ভেবে বলল, 'শক্‌টা কম নয়। দু'দিন পরে আর বলবেন না।'

'জানি।' বুলা বলল, 'বাবার কোন দোষ নেই। এতদিনের পরিশ্রম, আশা, স্বপ্ন—বাবার কি গেছে আমি জানি। আর দু'বছর চাকরি। তারপর আমরা কোথায় দাঁড়াবো, নিখিলদা !'

প্রচণ্ড বেগে একটা লরি ছুটে গেল সামনে দিয়ে। বুলার মুখ নামানো। চোখ দুটো পায়ের পাতায়। ভিতরের আবেগ চাপা দেবার জন্যে একটা বড় ঘাস চেপে ধরেছে দাঁতের মাঝখানে। স্থির চোখে ক' পলক ওর সাদা কপাল ও রুক্ষ মাথার দিকে তাকিয়ে থাকল নিখিল।

'কি ঠিক করেছ ? চাকরি করবে ?'

'আর কি করব !' হতাশ গলায় বলল বুলা, 'পড়াশুনো ছেড়ে পাঁচ বছর বসে আছি। এতদিন ঢুকে পড়তে পারতাম যা হোক কোথাও। দাদা দেয় নি। ঝুমি আছে, অলোকের স্কুল পেরোতে অনেক দেরি। দাদা এমন হঠাৎ চলে যাবে কে জানত !'

গভীর গলায় কথাটা শেষ করল বুলা। আঁচল তুলে মুখ মুছল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিখিলের হঠাৎ মনে হল, বুলাকে এতদূরে নিয়ে আসা ঠিক হয় নি।

কেন, তা নিজেও বুঝতে পারছিল না। কি বলবে বুলাকে ! ভেবো না, আমি আছি। আমার দায়-দায়িত্ব কিছু নেই, আমি কিছু দিতে পারব তোমাদের ! বড় বেশি উদার হয়ে পড়ছে না সে ! বড্ড নাটকীয় ! তার চেয়ে বরং বুলাকে কিছু আশ্বাস দেয়া ভাল—আজ অন্তত ও বাড়ি ফিরে যাক।

'বুলা, আজ ওঠো, ফেরা যাক।' নিখিল বলল, 'আমি ভাবি একটু। একটা উপায় বেরিয়ে যাবে—চিন্তা করো না।'

ঘন চোখে নিখিলের মুখের দিকে তাকাল বুলা। ঠোঁট কাঁপছিল। উঠতে উঠতে বলল, 'কোনদিন এ-রকম হবে ভাবি নি।'

নিখিল জবাব দিল না। কনকের মৃত্যুর দিন সকালে জানলায় দাঁড়িয়ে বুলা তাকে কি বলেছিল মনে পড়ল। পাশে এসে বুলা বলল, 'দাদার অফিসে আমায় একটা কাজ দেবে না ?'

আকাশটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। আজ হয়তো তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হবে।

বুলার প্রশ্নটা সাবধানে এড়িয়ে গেল নিখিল। ভারী পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে ওর হঠাৎই মনে হল, বুলা তো অমিয় বা শ্যামলের কাছেও যেতে পারত, তবু তার কাছেই এল কেন ! বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

বাস স্টপে পৌঁছেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বুলা। পরশু থেকে

দাশরথি অফিসে বেরুচ্ছেন ; সেই সুযোগে আজ সে বেরিয়ে পড়েছিল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনে এতক্ষণ যেন বুলা ভুলে ছিল, বিকেল পড়ে আসতেই তৎপর হল।

পর পর কয়েকটা বাস ছেড়ে দিতে হল। ভিড় খুব বেশি ; যতজন নামছে, উঠছে তার বেশি। নিখিল তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না। বুলার মুখ ক্রমশ ফ্যাকাশে হতে দেখে বলল, 'চল, একটা ট্যাক্সি নিই। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—'

'না, না।' বুলা আপত্তি করল, 'আপনি আলাদা যাবেন। আমি এসেছি কেউ তো জানে না।'

'বেশ। তোমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবো। আমি যাচ্ছি না—'

খানিক ছুটোছুটির পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বুলাকে উঠিয়ে নিজে উঠল নিখিল। সাবধানের দূরত্বে বসে খানিক চোখ বন্ধ করে গতি অনুভব করার চেষ্টা করল। ছিমছাম হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল মুখের ওপর দিয়ে—মৃদু ঘুমের মতন সেই পুরনো অবসাদ আবার চারিদিক থেকে ছেঁকে আসছিল। ট্যাক্সির সীটে গা এলিয়ে দিয়ে একা নিখিল সেই অবসাদে গা ভাসিয়ে দিল।

হয়তো অনেকক্ষণ সে এইরকম আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিল। চমক ভাঙল বুলার কথায়।

'দাদা কি আত্মহত্যা করেছিল নিখিলদা ?'

'কেন !'

নিখিল সোজা হয়ে বসল, সোজাসুজি তাকাল বুলার মুখের দিকে।

বুলার চোখ বাইরে। ক' মুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে আড়ষ্ট গলায় বলল, 'কি জানি, মাঝে মাঝে মনে হয়...।'

যেন কিছু বলতে চাইছিল বুলা, বলল না ; ওর গলা শুনে

সেইরকম মনে হয় নিখিলের। খানিক আগে যাকে মনে হচ্ছিল অত্যন্ত অসহায়, এখন আবার তাকে রহস্যময় লাগছে। সান্নিধ্যে থেকেও বুলাকে বড় বেশি অস্পষ্ট মনে হল নিখিলের। যেন এই ট্যাক্সিতে, তার পাশে, নিখিল নেই, বাকি পথটুকু সেইরকম কাঠ-কাঠ হয়ে বসে থাকল বুলা। আর কোন কথা হল না।

ট্যাক্সি থেকে নামার আগে বুলা বলল, 'দাদার একটা ডায়েরী খুঁজে পেয়েছি। আপনাকে দেখাবো।'

৭

এটা ওটা করতেই অনেকখানি বেলা গেল। পুজোর কাজকর্ম, জোগাড়, যা করার বুলাই করেছে। তবু ক্লান্তি যেন সবটা তারই। অলস, ঘুম-ঘুম লাগছে। সরবতের গ্লাসটা কোনরকমে এগিয়ে দিয়ে ঝুমি বলল, 'নাও।'

শ্যামলের হাত কাঁপল। খুব নিস্তেজ আঙুল ঝুমির। তবু, ছোঁয়া লাগতেই মনে হল আগুন। গ্লাসটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে বলল, 'জোর করে লাভ কি! একটু সামলে নিতে দাও, নিজেই খাবেন।'

'আজ নিয়ে ছ'দিন হল।' চোখে চোখ রাখল ঝুমি। 'লক্ষণটা ভাল নয়। সকাল থেকে জিব চুষছে।'

'ও। আচ্ছা, দেখি—'

গ্লাস হাতে ঘরের দিকে এগুলো শ্যামল। এ-সব কাজ তার ভাল লাগে না। মানুষ মরে, এটাই ঠিক; শোক সন্তাপের ব্যাপারটাও সত্যি। কিন্তু তা নিয়ে এত ঘুনঘুন করার কি আছে! এতেই কি কনক ফিরবে!

মনে মনে এইসব যুক্তি সাজালো শ্যামল। যা করছে, করতে হচ্ছে ঝুমির জন্যেই। ছুটির দিন বলে আজ একটু আগেভাগে এসেছিল। এসেই বিপত্তি! নিখিল বা অমিয়র তখনো দেখা নেই।

সমস্যা বসুধাকে নিয়ে।

এতগুলো দিন তবু যেমন-তেমন করে ছিলেন। কাজের ঠিক আগের দিন থেকে বেঁকে বসেছেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করছেন না। তাঁকে নিয়েই যত উদ্বেগ, ছুশ্চিন্তা। মেয়েদের কথায় কাজ হয় নি। বসুধার সেই এক রোখ, 'ছুটো দিন যেতে দে। আর তো তার কথা কেউ ভাববি না। আমার জন্যে আর ভাবিস কেন! খাই না খাই আমি আরো ঢের দিন বাঁচবো।'

পারতেন দাশরথি। কিন্তু, কনক যাবার পর থেকে তিনি আরো বেশি উদাসীন। কারও জন্যে তাঁর ভাবনার সময় নেই।

শনিবার কনক গেল। রবিবারটা কোনরকমে কাটিয়ে সোমবার সকালেই নাকে মুখে গুঁজে অফিসে বেরুলেন দাশরথি।

বসুধা বলেছিলেন, 'ক'টা দিন ছুটি নিলে হত না!'

'কেন! ছুটি নিয়ে হবেটা কি!' রোগাসোগা আপাত-নিরীহ মানুষটির ভিতরে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে ওঠে। 'বাড়ি বসে ছেলের জন্যে কপাল চাপড়ালেই কি এই রাবণের গুষ্টির ক্ষিদে মিটবে!'

দাশরথিকে ঘাঁটাতে কেউ আর তেমন জোর পায় না।

সংসারের এই পরিবর্তিত চেহারায় সারাক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকে বুলা। মৃত্যু মানুষকে কাছে টানে—টানে না কি! ছ' জনের একজন চলে গেল, এখন বৃত্তটা আরো ছোট হয়ে আসা উচিত ছিল। ভাল হত যদি পরস্পরনির্ভর হয়ে গায়ে গায়ে লেগে থাকত তারা। বৃত্তটাই এমন ভেঙে যাবে কে ভেবেছিল! বাবা মা ছু'জনকেই মনে হয় গুঁড়ি-কাটা গাছের শুকনো, বিচ্ছিন্ন ডালের মতো—যেন তাঁরা কোনদিন একসঙ্গে ছিলেন না। অলোক ছোট, নিতান্তই ছোট, এখন খানিকটা দিশেহারা। ঝুমির ভাবসাব বুঝতে পারা মুশকিল—মৃত্যুর অনুভবের চেয়েও বড় কোন অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সারাক্ষণ। শ্যামলের কাছে ও কি কোন আশ্বাস পেয়ে গেল! আজ সকালেই পুজোর জোগাড় করতে করতে

আঙুল বাড়িয়ে বলেছিল, 'দিদি, ধরতো—'

দেখেশুনে মনে হচ্ছে মাটিতে পা নেই ঝুমির। ক্রমশ স্বপ্নের ভিতর গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। স্বপ্নটা ওকে হাসায়, থেকে থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়। এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই মনের ভিতর গুন গুন করে উঠছে। যদি এমন হয়, সত্যি সত্যিই নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলল ঝুমি, চলে গেল, সে কি করবে! বাবাকে ভরসা করা যায় না আর। হত, যদি দাদা থাকত, সে-ই আগে যেত। এখন সে-রকম কিছু নেই, এ-সব ভাবনা অবান্তর। হিসেবনিকেশের বাইরে চলে গেছে সবকিছু।

বুলা একটা নিঃশ্বাস চাপল। তুপুর ঘন হল। এই সময় আকাশ ভর্তি রোদ থাকার কথা। পরিবর্তে দলা দলা মেঘে কালো হয়ে আসছে আকাশ। হয়তো বৃষ্টি নামবে।

চোখে ঝাপ্‌সা দেখল বুলা। না, তার একটা চাকরির দরকার।

শান্তিজলের ছটা কখন শুকিয়ে গেল কপালে। পুজোপাঠ শেষ। ভট্‌চায্যি মশায় নতুন গামছায় পুঁটলি বেঁধে সামনে এসে দাঁড়াল।

'মা লক্ষ্মী, আমাকে এবার যেতে হয়। ব্রাহ্মণের বিদায়টা দিয়ে দাও।'

বুলা কথাটা বুঝল। গলার খুশখুশে ভাবটা কাটিয়ে বলল, 'সবই তো পেলেন। আর কি চান?'

'ওভাবে কি বলতে আছে মা!' হাড় পাঁজরার ওপর পৈতে রগড়াতে রগড়াতে ভট্‌চায্যি বলল, 'পুণ্যবানরা তাড়াতাড়ি যায়। শান্তির রাজ্যে পৌঁছে দিলাম তোমাদের দাদাকে, ব্রাহ্মণকে এবার খুশি মনে বিদেয় করো।'

বুলার ভাবতে সময় লাগল না। তার হাত খালি, কিছু দিতে হলে এখন ভরসা দাশরথি। বাবার কাছে সরাসরি গিয়ে চাইবার মুখ নেই। খরচের বহর দেখে সকালে বলেছিল, 'ওই সঙ্গে বাপের পিণ্ডিটাও দিয়ে দিলি না কেন!' এখন কিছু বললে বারুদে আগুন লাগবে। অগত্যা বলল, 'বাবা বাইরে আছেন, ওঁর কাছে বলুন।'

ব্যাজার মুখে ভট্‌চায্যি বলল, 'দক্ষিণাটাও ভিক্ষে চাইতে হবে মা!'

কথা না বাড়িয়ে বুলা মা'র ঘরে গেল। খাটের ওপর মাথা হেঁট করে বসে আছেন বসুধা। শ্যামলের হাতে গ্লাসটা তেমনিই ধরা, বসুধাকে বুঝি কিছু বলার চেষ্টা করছে। এপাশে ঝুমি, খাটের বাজু ধরে দাঁড়ানো। কোণের দিকে টেবিলে কনকের বাঁধানো ছবি, ছবিতে মালা পরানো, কিছু খুচরো ফুল ছড়ানো। সকালে একডজন গন্ধধূপ জ্বেলে দিয়েছিল। পুড়ে পুড়ে এখন তার একটিই কোনরকমে জ্বলছে। মৃদু গন্ধ ভেসে এল নাকে। মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গন্ধটা কেমন ধাক্কা দিল যেন। গা গুলিয়ে উঠল।

বুলা বুঝল তার সারা শরীর মুচড়ে কান্না চাপ দিচ্ছে। ফাঁকা, রিক্ত মনে হচ্ছে সবকিছু। মা ঠিকই বলেছিল, এর পর তাদের একে একে ভুলে যেতে হবে। বাবার দাড়িকামানো পরিচ্ছন্ন মুখ দেখেও এই কথাটা মনে হয়েছিল। কিন্তু, এটা কাঁদবার জায়গা নয়। দেহের প্রতিটি রোমকূপে আবেগের অত্যাচার সহ্য করতে করতে সে পাশের ঘরে গেল।

পুজোর জন্যে যে-টুকু না করলেই নয় করে আবার বাইরে রোয়াকে এসে বসেছিলেন দাশরথি। এক হাতে কাঠের ফ্রেমে

বাঁধানো আয়না, অন্য হাতে, নিজের মুখ দেখতে দেখতে মাথার চুল ঝাড়ছেন।

এই মাসটা একমুখ দাড়ি নিয়ে নিজেকে কেমন পবিত্র লাগত। কর্কশ ভাবটুকু শেষের দিকে মোলায়েম হয়ে এসেছিল। অফিসে কাজের ফাঁকে গালে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ছেলেটা তার সঙ্গে বড় রকমের প্রবঞ্চনা করে গেল। এই দাড়ি তো তারই গালে গজাবার কথা! অনুভূতির বেশিটাই ক্রোধের, তবু তাঁর কি গেছে দাশরথি নিজেই শুধু জানেন। বুক চিরলে রক্তের বদলে আটান্ন বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা বালির মতো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে।

মুখটা প্রতিবারই ঝাপ্‌সা লাগছে। ধুতির খুঁটে আয়না মুছে দাশরথি চোখদুটো ছাড়া ভাঙাচোরা মুখের অনেকটাই দেখতে পেলেন। যুবক বয়সেই গেল, না হলে চোয়ালে, চিবুকে, নাকে অনেকটাই বাপের ধরন পেয়েছিল কনক। এক মাসে স্মৃতি খুঁড়ে এখানে ওখানে অনেক মিলই ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন দাশরথি। এখনো মনে হয় কত স্পষ্ট—সামনের রাস্তা দিয়ে সটান হেঁটে এসে সদরে পা দেবে!

'মিত্তিরমশাই?'

একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন দাশরথি। ভট্‌চায্যিকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন।

'হয়ে গেল সব—?'

'হল তো। দক্ষিণাটা পেলেই আমি রওনা হই।'

শরীর টান করে ভট্‌চায্যির চেহারাটা আপাদমস্তক লক্ষ করলেন দাশরথি।

'কেন! দেয় নি পাঁচ টাকা?'

'পাঁচ টাকায় তো পাঁচালি পড়া হয়, মিত্তিরমশাই। ছেলের

শ্রাদ্ধ বলে কথা—'

স্তব্ধ হয়ে ক' মুহূর্ত ভট্চায্যির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দাশরথি হঠাৎ বললেন, 'হবে না, আর কিচ্ছু হবে না। পয়সা কি খোলামকুচি নাকি !'

'আঃ, কি অলক্ষুণে কথা দেখুন তো !' ভট্চাযি বিরক্ত ভাব দেখাল, 'ব্রাহ্মণকে ঘরে ডেকে অপমান করছেন, মশাই ! আরো পাঁচটা টাকা দিন, আমি চলে যাই।'

'দেবো না, আর একটি পয়সাও দেবো না !' রোয়াক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দাশরথি। কপালের ওপর দপ্ করে একটা শিরা ফুলে উঠল। তারপর হাত উঁচিয়ে বললেন, 'আমার রক্ত জল করা রোজগারের টাকা। আমি বলছি, আর একটি পয়সাও দেবো না।'

দাশরথির গলা রীতিমতো চড়া। একটু বা ঘড়ঘড়ে, শ্লেষ্মা জড়ানো।

এই সময় রাস্তায় লোক চলাচল কম। ইতস্তত যে দু'চারজন হাঁটছিল, থেমে দাঁড়াল। কাছেই টিউবওয়েলে তেলকলের ক'জন গা ধুচ্ছে। সকলের নজর এদিকে। বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুলা বাবার গলা শুনল, কি ব্যাপার বুঝল না।

বেগতিক দেখে রোয়াক ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল ভট্চাযি। লোকজনকে শুনিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক তো, মশাই ! বায়না করে ডেকে আনলেন, এখন ধাপ্পা দিচ্ছেন ! পরকালের ভয় নেই !'

'কি, আমি ধাপ্পাবাজ ! আমাকে ভয় দেখানো !' ছোটখাটো একটা হুঙ্কার ছেড়ে ভট্চাযির গায়ের ওপর পড়লেন দাশরথি। কাঁধসুদ্ধ নামাবলিটা মুঠোর মধ্যে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'খুন করে ফেলবো। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি—'

'দেখুন আপনারা, দেখুন। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত দিয়েছে—',

পরিত্রাহি চীৎকার জুড়ে দিল ভট্চায্যি।

কিছু লোকজন ছুটে এসে ছ'জনকে আলাদা করে দিল চেঁচামেচি শুনে ওরাও বেরিয়ে এসেছিল—শ্যামল, বুলা, ঝুমি, অলোক। ভট্চায্যির নামাবলি রাস্তায় পড়ে থাকে, গামছা বাঁধা পুঁটলিটা একদিকে। ক্ষিপ্ত দাশরথি, প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'নিজের হাতে সন্তানকে পুড়িয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি। দাশরথি মিত্তির কাউকে ভয় পায় না। শ্রাদ্ধের মুখে আমি লাথি মারি—'

শ্যামল এসে তাড়াতাড়ি দাশরথিকে ছাড়িয়ে নিল। বাধা দিয়ে দাশরথি বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এর শেষ দেখতে চাই—'

সেই সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল। নিখিল নামল। এক পলকে গোটা পরিবেশটা বুঝে নিল ও। দরজার কাছে থ দাঁড়িয়ে আছে বুলা ঝুমিরা। পিছনে কোনরকমে দেয়ালে ঠেস দিয়ে উদ্ভ্রান্ত বসুধা। এ-বাড়ি ও-বাড়ির ব্যালকনি ও আল্‌সে থেকে কৌতূহলী মেয়ে পুরুষ উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে—টিউবওয়েলের সামনের ভিড়টা এখন মোটামুটি জমায়েতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে নিখিলের অতর্কিত আবির্ভাব আগুনে জল ঢালার কাজ করল।

শ্যামল ততক্ষণে দাশরথিকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। লড়াইয়ে হেরে-যাওয়া মানুষের হাঁটার ধরন দাশরথির। থেমে থাকার মধ্যেও একবার ক্ষুব্ধ গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'উঃ, কি ছনিয়া! পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনল না!'

নিখিল দেখল, ভিড়টা গলতে শুরু করেছে। দাশরথির গোটা পরিবারটা হঠাৎ হাঁ-করা দরজার ভিতর সেঁধিয়ে গেল। শূন্য রোয়াকের ওপর আয়না আর রুপোর বিড়ির কৌটো, দেশলাই

এই সমস্ত—দেখেই দাশরথির বলে চেনা যায়।

নামাবলিটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিখিল ভট্চায্যির কাছে গেল।

'কি হয়েছিল ?'

'কিছু তো হয় নি, বাবা।' পুঁটলির গা থেকে সাবধানে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ধাতব গলায় ভট্চায্যি বলল, 'খামোকা গালমন্দ করলেন মিত্তিরমশাই! বিদায়টা গুনে দিলেই আমি চলে যেতাম।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা চকচকে দশ টাকার নোট ভট্চায্যির নাকের সামনে তুলে ধরল নিখিল।

'বয়স তো অনেক হয়েছে। ওঁর কষ্টটা বুঝতে পারলেন না!'

ভট্চায্যি বিনা কথায় টাকাটা হাতে নিল। ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে চোখ নিচু করে কি ভাবল একটু।

'বুঝি, অন্যায় হয়ে গেছে। যজমানি করে দু' পয়সা পাই, এ ছাড়া আর কি!' একটু থেমে বলল, 'মিত্তিরমশাইকে বলো, পুজোয় ফাঁকি দিই নি। নারায়ণ রক্ষা করবেন ওঁদের—'

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভট্চায্যির চলে যাওয়া দেখল নিখিল। তারপর ফিরল।

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ভরসা হয় না। নিজের সম্পর্কে তার একটিই দুর্বলতা, সচেতনভাবে কখনো কিছু করতে পারে না। একটা ঝোঁক দরকার, যে-কোন রকমের একটা ধাক্কা। কনক বলত, ভাগাড়ের ঘোড়া, চাবুক না মারলে কখনো ছুটবি না!

ঠিকই। কড়া চাবুক মেরে গেলেন দাশরথি, অনুভব জুড়ে জ্বালাটা এখনো টের পাচ্ছে। না হলে এ-দৃশ্য কবে কে কল্পনা করেছিল! শুধুই কি ক'টা টাকা বাঁচাবার দায়ে আজকের দিনে রাস্তায় নেমেছিলেন দাশরথি! না, না তো!

শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি শুধুই বৃষ্টি। তবু নিখিলের হাড়ের মধ্যে

দিয়ে পর পর শীতের হাওয়া ছুটে গেল।

দাশরথির আয়না আর বিড়ির কৌটোটা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল নিখিল। থমথমে ভাবটা আগেই চোখে পড়ে। পুজোর বাসনকোসন তখনো বারান্দায় ছড়ানো। একদিকে চেয়ারের ওপর মাথায় পাট-করা ভিজে গামছা চাপিয়ে বসে আছেন দাশরথি; পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পাখার বাতাস করছে ঝুমি। বুলা বুঝি ঘরের কোথাও ছিল, বেরিয়ে এসে পুজোর জায়গাটা গোছগাছ করতে লাগল।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে কব্জিটা ধরে ফেললেন দাশরথি।

'আমি ছোটলোক নই, বাবা। মাথাটা হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল—'

'জানি।'

স্বর স্পষ্ট হল না। দাশরথির ঘামে ভেজা হাতের স্পর্শ নাড়ির স্পন্দন দ্রুত করে দেয়। ঝুমির সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিখিল শুধলো, 'মা কোথায়?'

ঝুমি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল।

নিখিল শ্যামলকে খুঁজল। পেল না। তারপর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বিছানায় অর্ধশায়িতা বসুধা। নিখিলকে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে উঠলেন। নিখিল একটু অপেক্ষা করল, কিভাবে কথা শুরু করবে, আদৌ কিছু বলবে কিনা ভাবল। পাশের ঘরে শ্যামলের গলা পাচ্ছে, সম্ভবত ও অলোকের সঙ্গে আছে। এ-বাড়ির ঘরদোর এখন তাদের জন্যে হাট করা—অবাধ যাতায়াতে কোন অসুবিধে নেই। বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার সময়েই কথাটা মনে হয়েছিল তার। আপাতত বিছানার একপাশে সে বসার জায়গা করে নিল।

বসুধা এখন কথা বলবেন না, এটা প্রায় জানা কথা। ক'দিনই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে নিখিল। কাছাকাছি কেউ থাকলে মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন, মনে হয় কিছু বলতে চান। পরেই ভুল ভেঙে যায়। স্বগতোক্তি প্রায় তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আচ্ছন্নতার মধ্যে কার সঙ্গে আলাপ করেন বসুধা! নিজের সঙ্গে? নাকি নিজের ভ্রষ্ট বিশ্বাসের সঙ্গে এখনো তিনি সংলাপের জের টেনে চলেছেন!

তবু, এ-বাড়িতে বসুধাকেই ভাল লাগে। কনক ছিল, এখন নেই, আর কোনদিন থাকবে না—নিজের চলা, বলা, সারা দিনযাপনের মধ্যে, চিন্তা বা অনুভবের মধ্যে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কনককে আজকাল কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দূর স্মৃতির মতো মাঝে মাঝে অতর্কিতে এসে হানা দিয়েই চলে যায় আবার। বসুধার সান্নিধ্যে তবু মনে হয় কনক ছিল, আছে।

ইত্যাদি আবেগে নিখিল ভিতরে ভিতরে গলতে থাকে। টেবিলের ওপর সাজানো কনকের ছবি। খুব পবিত্র মন নিয়ে .কোনদিন হয়তো ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একই লক্ষ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখদুটো জ্বালা করে উঠল নিখিলের। হাতটা চলে গেল পায়ের পাতায়—এ-বাড়িতে মশার উপদ্রব বড় বেশি।

বসুধা হঠাৎ বললেন, 'অমিয় আসবে না?'

এতক্ষণ ধারণা ছিল অমিয় এসেছিল, চলে গেছে। বসুধার আকস্মিক প্রশ্নে বিমূঢ় বোধ করল নিখিল। ইতস্তত করে বলল, 'কি জানি! আর কি আসবে!'

আবার সেই চুপচাপ। নিখিল ভাবল, একবার ঘরের বাইরে ঘুরে আসা দরকার। তবু উঠতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে চাপা গলায় বসুধা বললেন, 'আমাকে একদিন অমিয়র বাড়ি নিয়ে যাবে নিখিল? রেখাকে দেখব।'

৮

অফিসে বেরুবার আগে রেখা ফের কথাটা তুলল।

'আমার জন্যে কি করছ?'

সামনে ঝুঁকে, ফ্লাইবাটনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে টেনেটুনে সার্টের ঝুল ঠিক করছিল অমিয়। শুনেও না শোনার ভান করল।

'কি ব্যাপার!'

'বাঃ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে!'

চলকানো শব্দ তুলল রেখা। বিরক্তির। পাট-করা রুমালটা টেবিলের ওপর রেখে পান আনতে গেল। এটা অমিয়র নতুন অভ্যাস।

এমন নয় অমিয় জানে না ব্যাপারটা কি। গত ক'দিন ধরেই আছে টানাপোড়েনের মধ্যে। চাপা মনোমালিন্য, অশান্তি, মাঝে মাঝে দু'পক্ষের কথা বন্ধ। অত্যন্ত অস্বস্তিকর ঘটনাগুলো।

দোষ কার বলা কঠিন। তার? রেখার?

না, রেখার নয়। হয়তো তার নিজেরও নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে রক্ত ক্রমশ শীতল হতে থাকে—অমিয় ঠিক বুঝে পায় না এই অশান্তির দায়িত্ব কার! নাকি সবই ভবিতব্য? আপাত-সুখের গোপনে অদৃশ্য নালি-ঘা'র মতো কিছু একটা বিস্তৃত হচ্ছে ক্রমশ; একদিন হয়তো তাদের কুক্ষিগত করে ফেলবে।

বৃষ্টিধোয়া চমৎকার রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে এই সকালেই প্রচ্ছন্ন বিষাদ অনুভব করে অমিয়। আয়নায় চুল আঁচড়াতে

গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায় কনকের মুখ, হাতটা আপনিই নীরব হয়ে আসে। খুব বেশিদিন তো হয় নি, তবু মনে হয় বহুদিন হল। বিশদভাবে আজকাল প্রায়ই তাকে মনে পড়ে না। তবু সে ছিল এটা অস্বীকার করা যায় না। চতুর্দিকে অনিবার্য অশান্তির মধ্যে প্রায় একটা স্বপ্নেব জগৎ তৈরি করে রেখেছিল। বেঁচে ছিল তীব্রভাবে—হঠাৎই একদিন চলে গেল চুপচাপ। কি যেন অসুখটা ছিল তার—লিউকোমিয়া! শরীরের ভিতর রক্ত, রক্তের ভিতর অগোচরের আক্রমণ—কনকই শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত হবে কে ভেবেছিল!

একান্তের স্মৃতি থেকে ফিরে এল অমিয়। সুস্পষ্ট একটা জ্বালা গলার ভিতর; রেখার হাত থেকে পানের খিলিটা নিয়ে মুখে পুরতে পুরতে এক ধরনের আতঙ্কে সামান্য কেঁপে উঠল।

'কি হল!' চুপচাপ দেখে রেখা বলল, 'কিছু বললে না যে!'

'কি আর বলব!'

সাবধানে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল অমিয়। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে আড়চোখে দেখল রেখাকে। থমথমে মুখ, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। দেখে মনে হয় নির্জনে একচোট কেঁদে এল এইমাত্র। শরীরের ভার ওকে ক্রমশ কাহিল করে ফেলছে। আর দু'মাস। না কি তিন মাস! অন্যমনস্কতার জন্যই হিসেবটা গুলিয়ে ফেলল অমিয়। চোখ দুটো আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল।

'রোজ রোজ এ অশান্তি আর ভাল লাগে না, রেখা!' কাছাকাছি এগিয়ে এল অমিয়। 'অশান্তি করে কি লাভ!'

'আমাকে দোষ দিচ্ছ?'

'না।' টেবিলের ওপর থেকে বাকি পানটা তুলে মুখে পুরল

অমিয়, 'দোষগুণের কথা নয়। অশান্তি হচ্ছে, এটাই ঠিক—'

পানের রসে মুখের ভিতর শব্দগুলো এলিয়ে পড়ছে। পিক ফেলার জন্য জানলায় গেল অমিয়।

'অশান্তি তোমার একার নয়।' রেখা বলল, 'স্ত্রীকে যে-লোক প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ করে—'

মাঝপথে আঁটকে গেল রেখা, সম্ভবত অমিয়র চোখের দিকে তাকিয়ে।

'আমি তোমায় সন্দেহ করি না।' স্পষ্ট গলায় কথাটা বলে একটু থামল অমিয়, পরেরটা ভেবে নিল। 'একটা সত্যি ঘটনাকে দিনের পর দিন তুমি অস্বীকার করে যাচ্ছ, ভাবছ আমি নির্বোধ। এত জেদ কেন তোমার!'

'জেদ!' রক্তশূন্য মুখ রেখার, উত্তেজনার মুহূর্তে আজকাল সে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিঃশ্বাস নিয়ে বলল; 'আমি কি কিছু বুঝি না! ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করেছিলে—এতদিন আমাকে ব্যবহার করেছ। এতদিন সুযোগ খুঁজছিলে, ও মারা যাবার পর পেয়ে গেলে—'

'কি যা তা বকছ!' অমিয় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। 'তোমার ব্যবহারেই তুমি সব স্পষ্ট করে দিচ্ছ। এতদিন ও হাসপাতালে থাকল, একদিনও গেলে না। সেদিন শ্যামল এল বাড়িতে, কথা বললে না। আমি কে! বাইরের লোকও সব বুঝতে পারে—'

'জানি', দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রেখা, 'তোমার বন্ধুরা তোমাকে ওস্‌কাচ্ছে। আমি ঠিক করে ফেলেছি—আমার শরীরে সইছে না। তুমি দাদাকে খবর দাও, আমাকে নিয়ে যাক।'

স্তম্ভিত চোখে খানিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল অমিয়। জ্বালাটা মাথা থেকে নেমে যেতে দিল।

'যাওয়াটা এ-বাড়ি ও-বাড়ির ব্যাপার, যখন ইচ্ছে যেতে পারো।

কিন্তু—',নিজেকে সংযত করে অমিয় বলল, 'এ অবস্থায় এমনভাবে মাথা গরম করে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

'আমি পারব না—।' অতর্কিতে ভেঙে পড়ল রেখা। 'আমার অসহ্য লাগছে—'

'বেশ। আমি বিজনকে বলব।'

খাপছাড়া ভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলল অমিয়। বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়াল একটু।

'সবটাই নিজের মতো করে ভাবলে। আমি তোমায় একবারও যাবার কথা বলি নি—'

রোদ তেমন তীব্র নয়। বর্ষার শেষ; মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নীল আকাশ উপুড় হয়ে পড়ছে। আকাশে তাকিয়ে রবিবারের মতো লাগে। ছিমছাম হাওয়া। এখন শরীর আরাম চায়।

হাঁটতে বেশ ক্লান্তি লাগছিল অমিয়র। শরীরে একটা টিসটিসে ভাব, মৃদু জ্বরে যেমন হয়—মনের ওপর শবীবের আধিপত্য নিয়ে সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতেই মনে হয় কলকাতার শ্বাস রোধ হয়ে আসছে ক্রমশ, প্রতিদিনই মানুষের হাঁটবার, দাঁড়াবার, বেড়াবার জায়গা কমে যাচ্ছে। কালও সে একই বাস্তায় হেঁটে গেছে, কিন্তু রাস্তাটা এত সঙ্কীর্ণ ছিল না, অনবধানে সে দু'জনের গায়ের ওপর দিয়ে পেরিয়ে এল। একটু অশোভন হল হয়তো—কেউ কিছু বলল না, ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। তার মানে কি এই, মানুষ ক্রমশ সহনশীল হয়ে উঠছে!

না, এতটা ভাবা ভুল। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে, ভুল। আজকাল অল্পেই তার রাগ হয়, গা জ্বালা করে, ট্রামে-বাসে সামান্য ক্লেশ সহ্য করতে খারাপ লাগে—ছোটখাটো সামান্য কথাবার্তার মধ্যেই অপমানের বীজ খোঁজে। সত্যিই এ-রকম। না হলে রেখার

সঙ্গে তার ঠিক এতটা মনোমালিন্যের কারণ ছিল না। বিয়ের আগে কনকের সঙ্গে রেখার যে কোন রকমের একটা সম্পর্ক ছিল তা কি সে বিয়ের আগেই জানত না! যে-কোন কারণেই হোক, বিয়ের পর রেখা ক্রমশ বন্ধুদের, বিশেষত কনককে, এড়িয়ে চলছিল —তারপরও দু'বছর হয়ে গেল, রেখার গর্ভে এখন তার সন্তান; তবু, রেখার শরীর, রেখার মুখ, দূরের বা কাছের রেখাকে দেখে প্রায়ই কেন তার নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে হয়!

হতে পারে তার সমস্যা আলাদা, বড় বেশি ব্যক্তিগত। এই মুহূর্তে যারা হাঁটছে, বাজার করছে, অফিস যাচ্ছে তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সে একা, সম্পূর্ণ একা, নিকট বা দূরেব সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। তার স্ত্রী আছে, আছে বন্ধুবান্ধব, এই বৃহৎ ব্যস্ত কলকাতায় ছুটে যাবার মতো পরিচিতের অভাব নেই। কিন্তু, এই মুহূর্তে এমন কাউকে মনে পড়ছে না, নিজেব দৈন্য নিয়ে যার ওপর পরিষ্কার নির্ভর করতে পারে।

চিন্তাটা অমিয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলল। ঘন নিঃশ্বাস পড়ল তার। নিজের মধ্যে নির্জন, গভীর সমুদ্রে দ্বীপের মতো ভেসে উঠল সে।

মাথায় পাগলা ঘন্টির মতো একটা শব্দ ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছিল। তক্তা বিছানো রেলের লাইনগুলো পেরুতে গিয়ে অমিয়র মনে হল সে ক্রমশই পিছনে হাঁটছে; অথচ তার এগিয়ে যাওয়ার কথা। পা দুটো অসম্ভব ভারী, ভারী চোখের পাতা। কি হল হঠাৎ! শরীরের ওজন বেড়ে যাচ্ছে না কি! আকস্মিক রোগে সে কি হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে! মৃগী! স্বপ্নের মতো একটা আচ্ছন্নতাব ঘোরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অমিয় নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করছিল, হঠাৎ ট্রেনের শব্দের আগে আগে একটা বাড়ানো হাত ছোঁ মেরে টেনে নিল তাকে।

‘কি মশাই! মরবেন নাঁল অমিয়। ভাল হত যদি এখন বাড়ি
কাছাকাছি যারা লেভেল ক্রসাঁড়া কেটে গেল রেখা!
অমিয় দেখল প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়ে ট্রেনটা স্কু রেখা; একানুবর্তিতা থেকে
উত্তাপহীন গলায় সে আউড়ে গেল, ‘বজবঙকে দূরে—মাঝে মাঝে
অপরিচিত উদ্ধারকারীর মুখের দিকে গভীর কে দূরে। গভীর
তাকিয়ে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ।’ ার কিছুদিন।

কি হয়েছিল বুঝতে সময় লাগল না। সদ্য স্নান-ক
শরীরে জামা কাপড় পরার মতো জ্যাবজ্যাবে ভাব নিয়ে হেঁটে এই। খানিকটা। একটু অস্বস্তি লাগছিল। যদিও আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে, উল্টো সোজা ভিড় ঠিক পরস্পরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এইমাত্র মৃত্যুর হাত থেকে ফস্‌কে আসা লোকটির জন্য কারও কৌতূহল নেই। শান্তভাবে অমিয় তার উদ্ধারকারীর মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করল, মনে পড়ল না—নাঃ, মনে পড়ছে না। বাঁচা গেল—বস্তুত আশ্বস্ত হল অমিয়, জীবনদানের জন্য কারও কাছে তাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে না।

বসে যাবার জন্য প্রথম ট্রামটি ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় ট্রামটিতে স্বচ্ছন্দে জায়গা পেল অমিয়।

ততক্ষণে অফিসের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কোনরকম বিচলিত বোধ করল না সে। অফিসে তার যাতায়াত অত্যন্ত নিয়মিত, কোন দুর্বিপাক না ঘটলে বছরের গোড়াতেই সে ক্যাজুয়াল লীভগুলো গুছিয়ে নিতে পারে। এ-বছর তেমনি একটি দিনই শুধু গেছে—শনিবার, কনকের মৃত্যুর দিন। আর আজ সে মৃত্যু পেরিয়ে এল খুব সাবলীলভাবে, ইস্পাতের লাইনের ওপর ছিঁটেফোঁটা রক্তের দাগও লাগে নি। চমৎকার! বেঁচে থাকার প্রতি আশ্চর্য মমতায় কিছুক্ষণ মূক হয়ে থাকল সে। আজ সে অফিসে না গেলেও পারে। বরং মৃত্যুর নামে সে একটু

সঙ্গে তার ঠিক এতটা মনোমালিন্যের ˉ
কনকের সঙ্গে রেখার যে কোন্অলসভাবে কিছুক্ষণ হাঁটল অমিয়।
কি সে বিয়ের আগেই দ্বন্দ্ব তাড়াল মন থেকে। আজ অনিয়ম,
বিয়ের পর রেখা অ্যানুয়াল লীভ নেবে। এমনিতেই পচে যায়,
—তারপরও স্থ' উপলক্ষের জন্য মাথা কুটতে হয়। আশ্চর্য,
তবু, রেখা নেই বলেই সে এতদিন ছুটি নেয় নি ; কোনদিন মনে
প্রায়ইএমন উপলক্ষহীন কেটে যাচ্ছে জীবন !

ভাবতে ভাবতে সে পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে এল, বাঁক নিল মেয়ো রোডের দিকে। আধ ঘণ্টা আগে যে-হাঁটুতে প্রকম্পন অনুভব করেছিল, সেই হাঁটুতেই এখন অসম্ভব জোর—অমিয় হাঁটছে—অসম্ভব স্ফূর্তি মনে, আকস্মিক মৃত্যুর স্পর্শ যেন তার নেতিয়ে-পড়া অস্তিত্বটাকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

যেতে যেতেই সে মোটামুটি একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে নিল। ফোনটোন করে বিজনকে পাওয়া যাবে না। কাছেই অফিস তার ; একবার ঢুঁ মেরে দেখতে ক্ষতি কি !

বারোটার কিছু আগে প্রিনসেপ্ স্ট্রীটে বিজনের অফিসের কাঠের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তুলে ওপরে উঠে এল অমিয়। কতদিন পরে ঠিক মনে করতে পারল না। তবে ছ'মাস তো হবেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই মনে হল বিজন ক্রমশ উন্নতি করছে। কেন মনে হল বলা যায় না। বিজনকে সে কোনদিনই তেমন পছন্দ করে না, রেখার দাদা বলেই যে-টুকু সম্পর্ক। সম্ভবত এখন তার সবকিছুই ভাল লাগবে, এখন তার চোখে ক্ষমা ছাড়া আর কিছু নেই।

বার্নিশ-করা পুরু কাঠের চকমকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তবু একটু দ্বিধা হল অমিয়র। রেখাকে কি সে ক্ষমা করতে পারে না ! আর একটু উদার হওয়া কি আর এমন শক্ত ! ফিরে যাবে ?

মায়া মমতায় ফুলে উঠল অমিয়। ভাল হত যদি এখন বাড়ি ফিরে বলা যেত—একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়া কেটে গেল রেখা!

না। বরং কিছুদিন দূরে থাকুক রেখা; একানুবর্তিতা থেকে দূরে; ঘাম, ক্লেদ, রোমশ রাত্রিযাপন থেকে দূরে—মাঝে মাঝে বিড়ালের মতো পরস্পরের প্রতি ফুঁসে-ওঠা থেকে দূরে। গভীর চোখে অমিয় তার ভ্রূণকে পাশ ফিরতে দেখল। আর কিছুদিন। এই সময়টা রেখার ভাল থাকা দরকার।

নিঃশব্দে প্যাঁচ ঠেলে ভিতরে ঢুকল অমিয়। বিজন নেই। চুরুট মুখে সামনে বসা মেয়েটিকে ডিক্টেসন দিচ্ছিল বামনদাস। আচমকা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আসেন, আসেন। মোস্ট ওয়েলকাম—'

চেষ্টা সত্ত্বেও কথার টান এখনো কাটাতে পারে নি বামনদাস। ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে পরিচ্ছন্ন গালের ওপর নতুন ব্লেডের ঝিলিক খেলে গেল। রেখার সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম আলাপেই বলেছিল, 'আদি নিবাস মৈমনসিং? মশয়, আপনিও তো তবে বাঙাল!'

মনে পড়ে না কবেকার কথা। ছকে পরিষ্কার লেখা আছে, জন্ম: ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬, কলিকাতা। রেখা আর সে পাঁচ বছরের ছোটবড়।

বামনদাস মেয়েটিকে যেতে বলল। সেই চেয়ারেই বসল অমিয়।

'পার্টনার কোথায়?'

'পাবেন না কি এখন!' চুরুটটা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ল বামনদাস। 'আপনিও যেমন! বর্ষায় দুটা জিনিসের জোর হয় —ব্যাঙের ছাতা আর আমাদের ব্যবসা। বসে না তো এক্কেবারেই। ামিই হয়ে আছি এক ইনডোর স্টেডিয়াম। দ্যাখেন গিয়া রাইটার্স নিউ সেক্রেটারিয়েটে ধর্ণা দিতেছে।'

চুরুটটা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল বামনদাস। টেবিলের পড়ে-থাকা ফাইলটা পাচার করে দিল ড্রয়ারে। টাইয়ের নট্ আলগা করতে করতে হাসল অমায়িক।

'তেরপলের কারবার তাহলে ভালই চলছে ?'

'তেরপলে সীমাবদ্ধ থাকলে কি চলে! এখন আবার জুট ব্যাগ সাপ্লাই ধরেছি।' একটু থামল বামনদাস। 'অফিসটা কেমন দেখছেন ? কলি ফেরে নাই ?'

অমিয়র বুকের মধ্যে বজবজ লোক্যালটা দৌড়ে গেল হঠাৎ। বামনদাস আত্মসুখী ; তাকে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা বলা যাবে না। তার দরকার বিজনকে।

'ভালই তো।' নিঃশ্বাস পড়ার আগেই অমিয় বলল, 'আসবে ?'

'ভরসা নাই।. ফোন করেছিল খানিক আগে। তবে, আর আধঘণ্টাটাক পরে কফি হাউসে গেলে পাবেন।'

আর কোন প্রশ্ন নেই। বিজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে আপাতত বামনদাসের সঙ্গে কথা চালানো দরকার। কি কথা বলবে সে! ভাসা ভাসা আলাপ, ভদ্রতায় যে-টুকু চলে ইতিমধ্যেই তা শেষ হয়েছে। একসময় কথা বলার জন্য সারাক্ষণ ঠোঁট সরসর করত, প্রসঙ্গ তৈরি হত নিজে নিজেই। চৈতন্য জুড়ে এখন শুধুই শব্দের প্রতারণা। এমালসন পেন্টেড দেয়ালের পরিচ্ছন্নতায় অমিয় নিজের শব্দহীন অনুভবগুলো ছড়িয়ে থাকতে দেখল। আর কিছু নয়, যে-কোন উপলক্ষ পেলেই সে এখন উঠে পড়তে পারে।

সুবিধে এইটুকু, বামনদাস এখন বাইরের কল্ অ্যাটেণ্ড করছে।

হাত বাড়িয়ে সৌখিন পেপারওয়েটটা মুঠোয় চেপে ধরল অমিয়। খানিক আগেকার ঘনবদ্ধ ভাবটুকু এখন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এত তাড়াহুড়ো করে বিজনের এখানে ছুটে

আসার তেমন কারণ হয়তো ছিল না। আশ্চর্য, বজবজ লোক্যালের ঝড়ো বাতাস চেতনা স্পর্শ করতেই সে কেন ধরে নিয়েছিল আজ তার মৃত্যু হতে পারত! এখন বাড়ি ফিরতে পারবে না —এখন তার কোথাও যাবার নেই!

'কি খাবেন?' ফোন রেখে বামনদাস বলল, 'চা, না ঠাণ্ডা কিছু আনাবো?'

'কিচ্ছু না—', প্রথম সুযোগটাই কাজে লাগালো অমিয়। 'আমি উঠছি। কফি হাউসে যাব। বিজন এলে বলবেন।'

বামনদাস না করল না। তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টেনে বলল, 'একটা ভাল সিগারেট খেয়ে যান।'

লাইটারটা নাকের সামনে জ্বেলে ধরে বামনদাস বলল, 'হ্যাঁ মশায়, আপনার সেই বন্ধু কনকবাবু নাকি—'

'মারা গেছে—'

'শুনলাম তো।' এইসব সময় যতটা গম্ভীর হতে হয় তাই হল বামনদাস। দরজার প্যাঁচ টেনে সরে দাঁড়ালো। 'স্যাড নিউজ লাস্ট সিজনে একদিন ক্রিকেটের টিকিট দিয়েছিলেন, মনে আছে? সোবার্সের ব্যাটিং দেখা হল—'

কাঠের সিঁড়ি। নামবার সময় ধপ ধপ বেখাপ্পা শব্দ হয়। একদিন ভোর রাতে নিঃশব্দে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল তারা—মনে হয় নি কোনদিকে সিঁড়ির শেষ আছে। ভোরের পবিত্র হাওয়ায় প্রথম শব্দ হেনে রাতের ঘুম থেকে কলকাতাকে জাগিয়ে তুলেছিল ট্রাম। না, কোন মহিমা ছিল না কনকের মৃত্যুতে; রক্তলোভী ক্ষুদ্র একটি মশা ছাড়া আর কোন সাক্ষীর দরকার হয় নি তার। অথচ, কনকের জন্য সামান্য সহানুভূতিও বোধ করল না অমিয়! মারা গেছে—,তুরুপের তাসের মতো অনায়াসে শব্দ ছুটো ছুঁড়ে দিতে পারল সে—স্বার্থপর, বড়

স্বার্থপর তুমি! ভালবাসাহীন যে চলে গেল পৃথিবী থেকে, তার প্রতি এত ঈর্ষা কেন!

অমিয় হাঁটছিল। অন্যমনস্ক। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমেই চমকে উঠল।

'আরে! মেসোমশাই!' তৎপর হতে সময় লাগল না বিশেষ, 'এদিকে?'

নাকের ওপর চশমাটা নামানো। শুকনো মুখ। তবু গাল ছড়িয়ে হাসলেন দাশরথি।

'ঐ ইনসিওরেন্সের টাকাটার তদ্বির করতে—।' ঘড়ঘড়ে গলা দাশরথির। আপাদমস্তক অমিয়কে লক্ষ করে বললেন, 'তলে তলে কেমন বাহাত্বর ছিল গ্যাখো! দশটি হাজার টাকা দিয়ে গেল তো!'

অমিয় একটা ঘা খেল। কথা ফুটল না মুখে।

'তুমি কোনদিকে?'

কোনরকম ব্যস্ততা নেই দাশরথির। মাঝ রাস্তা থেকে সরে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

'কাছেই। কফি হাউসে—'

'ও। কফি খাবে তো?' কাঁচা-পাকা ভুরুর তলায় চোখ ছুটো চকচক করে উঠল দাশরথির। 'এক আধবার গেছি। সেও কতদিন আগে! কতকাল যে কফি খাই না!'

'খাবেন? আসুন না—?'

'তোমার সঙ্গে!' দ্বিধা নয়, দ্বিধার ভাব করলেন দাশরথি। 'তা বেশ। চলো···একটু চাঙ্গা হয়ে নিই। সারাদিন ঘোরাঘুরি!'

বিরক্তিটা চেপে গেল অমিয়। রাগ করে ফল হবে না। রেখার সঙ্গে মন কষাকষি, বজবজ লোক্যাল, বামনদাস এবং দাশরথির সঙ্গে আলাপ—এইরকম যোগাযোগ নিয়েই শুরু হয়েছিল

আজকের দিনটা। হঠাৎই তার মনে হল আজ আরো কিছু ঘটবে ; এমন কিছু, যা তার সম্পূর্ণ প্রত্যাশার বাইরে, যা সে পছন্দ করে না একেবারে। তবু ঘটবে, আর মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে তাকে। এইসব ভেবে বিমর্ষ বোধ করল অমিয়। বিজনের সঙ্গে দেখা করার তীব্রতা কমে এল আস্তে আস্তে।

দাশরথি আসছেন পিছনে পিছনে। হাতে খাঁকি রংয়ের পুরনো খামে দশ হাজার টাকার স্বপ্ন।

কনকের দাম ! বলা যায় না, দাশরথির বুক খুঁড়লে হয়তো এখন অন্য কিছু দেখা যাবে, যা নিশ্চিত শোক নয়—কনকের মৃত্যুর চেয়ে যা নিশ্চিতভাবে বড়। শ্মশান থেকে ফেরার সময় সেদিন কি যেন বলেছিলেন দাশরথি ! এরিয়েলের তারে আঁটকে-পড়া বিবর্ণ ঘুড়ির মতো আবছা একটা স্মৃতি ভেসে গেল চোখের ওপর দিয়ে। রোদ্দুর তীব্র হওয়ার ফলেই সম্ভবত অমিয় আর কিছু ভাবতে পারল না।

বিজন ছিল না। বামনদাস এমন কিছু বলে নি যাতে মনে হতে পারে বিজন থাকবেই। প্রত্যেকটি মুখের ভিড়ে অমিয় বিজনকে খুঁজল। সঙ্গে দাশরথি ঝুলে থাকায় গতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। জায়গা পেয়ে ও দাশরথিকে বসিয়ে এনেক্সে যাবার জন্য রাস্তায়.নেমে এল।

না, নেই।

অনাবশ্যক, তবু ল্যাভাটরিতে গিয়ে আয়নার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অমিয়। দাঁতের ফাঁকে লুকনো মাংসের টুকরোর মতো অস্বস্তিটা ছাড়ল না তাকে।

কি হয় যদি দাশরথিকে একা ফেলে রেখে সে চলে যায়, ভাবল অমিয়। বিবেক ? না, সে-রকম কোন সংশয় তার নেই। কৈফিয়ত দেবারই বা আছে কি ! ভবিষ্যতে দাশরথির সঙ্গে তার

খুব একটা দেখা হবে না। হলেও, পাশ কাটিয়ে যাওয়া কি আর এমন কঠিন কাজ! এই মানুষটি সম্পর্কে তার মনে কোন শ্রদ্ধা নেই, ছিল না কোনদিন। আর এই মুহূর্তে স্পষ্টই সে দাশরথিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

কফির ব্যবস্থা নিজেই করেছেন দাশরথি।

'লোকটা দু'বার খোঁজ করে গেল।' অমিয়কে ফিরতে দেখে বললেন, 'ভাবলুম অর্ডারটা দিয়েই দিই।'

'ভালোই করেছেন—'

আড়াআড়ি চেয়ার টেনে বসল অমিয়। দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরোটা জিভ বুলিয়ে তোলবার চেষ্টা করল কয়েকবার। পট থেকে নিজের কাপে কফি ঢেলে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু খাবেন?'

'না, না। শুধু তুমি ডাকলে বলে—'

এক চুমুকেই সশব্দে অনেকটা কফি একসঙ্গে গিলে ফেললেন দাশরথি, 'চমৎকার, চমৎকার জিনিসটা!'

নিজেরটা ঠাণ্ডা হতে দিল অমিয়। এইভাবে যতটা সময় যায়। বিজন আসবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। যদি না আসে, এর পরের সময়টা কি করে কাটাবে কিছুই ঠিক নেই। শ্যামল বা নিখিলের সঙ্গে দেখা করা যায়। যদি দু'জনকে বা দু'জনের একজনকেও ধরা যায়, তাহলে স্বচ্ছন্দে খেলার মাঠে চলে যেতে পারে তারা। বহুদিন তারা একসঙ্গে থাকে নি, বহুদিন একসঙ্গে পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো হয় নি। আজ সময় ছিল, আর উপলক্ষ, আজ তারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারত।

ভাবনাগুলো এসে যাচ্ছে পর পর, ঘুরন্ত পাখার ব্লেডের মতো একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। এইভাবে তার দৃষ্টি ও চেতনায় কফি হাউস, বন্ধুদের মুখ, অপরিচিত বহু

মানুষের মুখ, ট্যাক্সি, মোটর, ট্রাম, বাস, শব্দ ও রঙ ক্রমশ একাকার হয়ে গেল। কোন চিন্তাতেই সে আর উৎসাহ পেল না। বাড়িতে, অফিসে বা বাইরে সে যেমন আছে থাকবে, অমিয় ভাবল। বৈচিত্র্যহীন একার জীবন। এই মুহূর্তে বিজনের আসা না আসায় তার কিছুই এসে যাবে না। রেখা কোন সমস্যা নয়। সে নিজেই কি!

উদাসীন ভাবনার মধ্যে ক্রমশ গভীর বিষাদে ডুবে যাচ্ছিল অমিয়। ঠাণ্ডা কফির কাপটা তুলে আস্তে ঠোঁটে ছোঁয়াল। প্লাস্টিকের .নলের মতো কিছু একটা নেমে যাচ্ছে বুক দিয়ে, পেটের কাছে পাক দিতে বিষম খেয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল ও।

'আর কি পাওয়া যায় এখানে ?'

দাশরথির লক্ষ পাশের টেবিলে। ছোট ছোট জলের বিন্দু কপালে। টেবিলে চশমা আর খাম। হাই তুলতে দাঁত-মাড়িসুদ্ধ আলজিভ পর্যন্ত গলার ভিতর অনেকটা দেখা গেল।

'কি খাবেন ? কাটলেট ?'

'হ্যাঁ। একটা কাটলেট খাই—'

একটু বা জোর গলায় বললেন দাশরথি, ব্যস্তভাবে বয়-কে খুঁজলেন। অমিয় কাটলেট আনতে বলল।

'তুমি হয়তো ভাবছ লোকটা হ্যাংলা! না, সে-রকম কিছু নয়—'

অসহায় মুখে হাসলেন দাশরথি। অপেক্ষার পর বললেন, 'আমার একটা ইচ্ছে আছে অমিয়। ইনসিওরেন্সের টাকাটা পেলে একদিন তোমাদের খাওয়াবো।'

অমিয় শুনেও শুনল না। বিস্বাদ মুখে বমির ভাব। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাচের দরজার বাইরে বাসস্টপ পর্যন্ত যতদূর দেখা যায় নির্বিকার তাকিয়ে থাকল সে।

দাশরথির হাতে ঝকঝকে ছুরি। ক্ষুধায় কদাকার মুখ। গরুর জিভের মতো সদ্য-ভাজা বস্তুটির গন্ধে নাক ডুবিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির গলায় বললেন, 'কালাশৌচের সময় বুঝি বাইরে খায় না। দেখ, ব্যাপারটা যেন আর কেউ না জানে।'

৬

স্বাভাবিক হলদে রঙ ক্রমশ নীলাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পর্দায়, চোখের পলকেই আবার লালের আভা। ঠিক লালও হয়তো নয় —যাকে ক্রিমসন বলে, অনেকটা তাই, রঙয়ের ওঠাপড়া দেখে মনে হয় জলের নিচ দিয়ে তীব্র বাতাস ছুটে চলেছে। ওরই মধ্যে ঘুমন্ত মেয়েটির অস্পষ্ট মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল আবার —ছুটো তেজী ঘোড়ার পা—ক্রমাগত রঙ বদলের আড়ালে পা ছু'টি অদৃশ্য হতেই আরেকটি দৃশ্য : অস্ফুট স্তনের ওপর সোনালি অশ্বক্ষুর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে ··

চোখের পাতা আপনিই বন্ধ হয়ে এল ঝুমির। কিছুক্ষণ ধরেই তলপেটে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে; কলসি থেকে জল উপচে পড়ার মতো কেমন ছ্যালছেলে অনুভূতি, কানের গরম গাল পর্যন্ত ছড়ানো। একবার বাথরুমে গেলে হত। শ্যামলের চোখ পর্দার ওপর স্থির; কাঁধে বাহুতে ছোঁয়াছুঁয়ি সত্ত্বেও বিভোর। পাশের ছুটো সীট খালি, পিছনে দেয়াল। বেরুতে হলে ওদিকের কিছু লোকের হাঁটুর গুঁতো খেয়ে বেরুতে হবে। না, সম্ভব নয়।

দামী মেহগনি খাটের ওপর চমৎকার বিছানা, ঝাড়লণ্ঠন, নতুন ধরনের দেয়ালঘড়ি থেকে ঝকঝকে সিঁড়ি, নির্জন রাস্তা— টর্চ ফেলার মতো করে দেখাচ্ছে এক একটা জিনিস। চোখের ওপর দিয়ে একটার পর একটা দৃশ্য পার করা ছাড়া আর কিছুই নেই। সংলাপ বুঝছে না বলেই অসুবিধে আরো বেশি। পাশের

হলে হিন্দী ছবি চলছে—কথা ছিল শ্যামল টিকিট কেটে রাখবে, ছ'জনে যাবে। টিকিট না পেয়ে অগত্যা এই হলে ঢোকা। জায়গাটা ভালই পেয়েছিল বলতে হবে, অনেকটা এইরকমই চেয়েছিল। গড়িমসি করে যখন ঢুকল, ছবিটা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।

কলেজ-ফেরত সুনন্দাদের বাড়ি যাবে, জন্মদিন, এই রকমই বুঝিয়ে এসেছে বসুধাকে। বাঁধা ছকে পা ফেলতে আজকাল আর অসুবিধে হয় না। দাদা যাবার পর থেকে মা অন্যমনস্ক, বাবা তিতিবিরক্ত ; একটু বেশি গালমন্দ করেন এই যা। স্বভাব! না হলে চলাফেরায় আজকাল সে রীতিমতো অবাধ, রীতিমতো স্বাধীন। বুলাই যা একটু আধটু চোখে চোখে রাখে। মাঝে মধ্যে উটকো এক আধটা প্রশ্ন করে বসে, সন্দেহের চোখে তাকায়, মুখে প্রায়ই 'ধরে ফেলেছি' ভাব। একে মেয়ে আর বয়সে পিঠোপিঠি বলেই কি! হতে পারে।

ঝুমি খুব অবাক হয় না। বিরক্তি যে-টুকু তা নিজেকে নিয়েই, অচেনা ভয়ে বুকটা সারাক্ষণ ধুকধুক করে।. বুলার সন্দেহ—ঈর্ষা নয় তো?—যতদিন না খোলাখুলি প্রকাশ পাচ্ছে, ততদিন অন্তত তার ভাবনার কিছু নেই। থাকলেই বা কি! দাদা যাবার পর সংসার থেকে যে-টুকু পাবার আশা ছিল সব গেছে। বাবা আর বেশিদিন বাঁচবে না ; অন্তত সে আর দিদি—ছ'জনের চিন্তাই দাশরথিকে মারবে আরো তাড়াতাড়ি। সময় থাকতে সে যদি নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলে, চলে যেতে পারে—আঃ, বাবার তাতে খুশি বই দুঃখ হবে না। দাদা বলত, তোরা ছুটোই বাবার যম! ছুটো প্যারালিটিক হাত! ঠাট্টা করেই বলত হয়তো। কিন্তু, ছাখো, কথাটা কেমন ফলে গেল!

দাদা, কনক, কনকেন্দ্র মিত্র। ডায়েরীর প্রথম পাতাতেই

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ছিল নামটা। দেশের বাড়িতে চতুর্দশীর রাতে জন্ম হয়েছিল না কি ; নিতান্তই ভাস্থরের নাম স্থধাবিন্দু, নয়তো ওই নামটাই বেশি পছন্দ ছিল বস্থধাব। মাথার দিকে একটা তারিখ ছিল, সম্ভবত ওই দিনই কিছু লেখাব কথা মনে এসেছিল দাদার। কি, ঠিক জানা যায় নি। যেত, যদি বুলা সবিয়ে না ফেলত। সামান্য জিনিস, কিন্তু, কেমন যেন অস্পষ্ট থেকে গেল পুরো ব্যাপারটা! কনক নামে কেউ একজন ছিল, যে তার দাদা, এখন ভাবলে কেমন ধাঁধার মতো লাগে। ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবিটায় প্রতি বুধবার আর শনিবার এখনো মালা পরিয়ে যাচ্ছে তারা। দাদার জন্ম আর মৃত্যুদিন। কিন্তু, প্রায়ই কৃত্রিম লাগে—অন্যান্য ছবির মতো লাগে। কনকেন্দ্র মানে কি!

এক বিছানায় শুতে হয় তাদের। এক বিছানায় শুতে গেলে প্রায়ই গায়ে গায়ে লাগে। বুলাব সঙ্গে তবু একটা দূরত্ব—বন্ধুরা কেউ বেড়াতে এসে ফিরতে পারে নি, ভোর হলে চলে যাবে, এই-বকম মনে হয়। বুলার কি মনে হয় কিছু? আজকাল কথা বলে কম, বেশির ভাগ সময়ই গম্ভীর হয়ে থাকে। যেন সাড়ে তিন নয়, বুলা আর তার মধ্যে বয়সেব ব্যবধান দশ বছরের। আজকাল 'দিদি' ডাকটা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। বুলা নামটা, অব্যবহারে, মনে পড়ে না আর—শাড়ি সায়ার নিচে চকচকে পুরুষ্টু হাঁটু দুটোর কথা যেমন আজকাল মনে পড়ে না। শুধু এক এক সময় আরো একজন কেউ জেগে ওঠে মনের মধ্যে, রোম খাড়া-করা বিচিত্র এক একটা অনুভব ছুলিয়ে দিয়ে যায় কেমন! এইরকম, প্রায়ই।

গতকাল গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে লক্ষ করেছিল বিছানার ওপর চুপচাপ জেগে বসে আছে দিদি। এ-ঘরে পাখা নেই, গরম; কিন্তু পাখা তো অনেকদিনই নেই—এইরকম গরমে তারা বরাবর

অভ্যস্ত। রাত খুব গভীর হলে একরকম শব্দ হয়, শব্দটা ওঠে বুকের মধ্যে। ঘন নিঃশ্বাস পড়ে দিদির। অন্ধকার মশারির ভিতর একটা উপুড়-করা পাথরের মতো লাগে। ডাকব? ডাকতে কেমন সাহস হয় না। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে একসময়। আস্তে আস্তে ঘুম আসে আবার। ঘুমের ভিতর, আস্তে আস্তে, কখন ভোর হয়ে যায়।

হাউসের অন্ধকার ঝুমির পা থেকে মাথা পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলল। ছোটবেলায় একটা প্রশ্নে প্রায়ই ধাঁধা লেগে যেত —পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, না সূর্য পৃথিবীর! পর্দার দিকে তাকিয়ে পর পর অর্থহীন দৃশ্যের প্রবাহে ওর সেইরকম মনে হল; সে কেন্দ্রাভিগ হয়ে আছে, অন্ধকারে একা, সামনে দিয়ে চলেছে মানুষজন, চলেছে ঘরবাড়ি, আয়না, টেবিল, ঝাড়লণ্ঠন, রাস্তা। যত ভয় এই থেমে পড়াটাকে নিয়ে।

চুম্বনের দৃশ্যে মেশিনের প্যাঁচের মতো শ্যামলের হাতের পাঁচটা আঙুল ওর আঙুলে জড়িয়ে গেল। কানের লতিতে শ্যামলের ঠোঁট। ফিসফিসে নিঃশ্বাস।

'কিছু দেখছ? না বসে আছ চুপচাপ?'

একটু কাত হয়ে শরীরটা সামনে গড়িয়ে দিল ঝুমি। সামনের সীটের তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল পা দুটো। সমুদ্রতীরে বালির ওপর শুয়ে থাকা অচেতন মেয়েটির জলে ভেজা মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে যুবকটি। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ একবার তাদের ওপর দিয়ে ফিরে গেল। তলপেটে আবার ঢেউ ভাঙার অনুভূতি টের পেল ঝুমি।

'ছোটবেলায় আমি একবার ডুবে গিয়েছিলাম—'

অস্পষ্ট স্বর। শ্যামলের চিবুক ওর কাঁধের ওপর নামানো। প্যাঁচানো আঙুলের ভাঁজগুলো ঘামে ভিজে সিরসির করছে।

'কোথায় ?'

'বহরমপুরে। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। বাড়ির লাগোয়া পুকুর—চোরা কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মাথার ওপর কেউ দু' মণ পাথর চাপিয়ে চেপে ধরেছে—'

শ্যামল সাড়া দিল না। বাঁ হাতে বুকের ওপর থেকে শ্যামলের হাতটা সরিয়ে পা ক্রশ করে বসল ঝুমি। অনেকটা এখনকার মতো, বা মাঝে মাঝে আজকাল যেমন লাগে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁ করল ঝুমি।

ঘাড় থেকে মুখ তুলে শ্যামল বলল, 'তুমি কোন্ সাবান মাখো ?'

ঝুমি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ইণ্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠল।

বর্ণ, স্পর্শ, গন্ধ থেকে আবার সেই দূরত্বের শুরু ; যেন এতক্ষণের ঘন আবেগের সবটাই মিথ্যে। আলো জ্বলে ওঠার পর মনে হল অন্ধকারটাই ছিল ভাল, ছিল নৈকট্য, সান্নিধ্য, নিঃশ্বাস। সম্ভবত এটা পুরনো ছবি, তার দেখা. শ্যামল সেইরকমই বলেছিল। প্রায় ফাঁকা হাউসের লোকবিরলতা দেখে সেইরকমই মনে হয়।

শ্যামল আড়মোড়া ভাঙল, 'ঘুরে আসছি, বসো।'

ঝুমি একটু ইতস্তত করল, তারপর উঠল। অস্বস্তিটা অনেকক্ষণ ধরেই চেপে রেখেছে। হাউসের লবিতে অন্যরকম হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ও ভাবল, যে-করেই হোক, শ্যামলকে আজ কথাটা জিজ্ঞেস করবে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে শ্যামল কিছুক্ষণ ঝুমির জন্য অপেক্ষা করল। ঝুমি সম্পর্কে এখন তার মনে কোন অনিশ্চয়তা নেই। এখন সে অনায়াসে ঝুমিকে ভাবতে পারে অধিকারের বস্তু হিসেবে—একান্ত করে, শারীরিক প্রচণ্ডতার ভিতর দিয়ে। দাশরথি, বসুধা,

বুলা থেকে আলাদা করে। আর, কনক তো মৃত! নিখিল বা অমিয় সম্পর্কে তার কোন মোহ নেই, বন্ধুত্ব ব্যাপারটাই আজকাল কেমন গোলমেলে লাগে। অমিয় বা নিখিল তাকে পছন্দ করে না, অনেক-দিনই মনে হয়েছে এই কথাটা। তবু হাসপাতালের কেবিনের বাইরে একসঙ্গে রাত জেগেছে তারা, জড়াজড়ি করে, গায়ে গা লাগিয়ে। ঠিক বোঝা যায় না কেন! আড্ডা, খেলার মাঠ, কাছাকাছি থাকা, এগুলো কি কোন নির্ভর? বিশ্বাস হয় না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঝুমির ঘন হয়ে আসা চোখ মুখ লক্ষ করল শ্যামল। দু' স্লাইস চর্বির মতো ঠোঁট দুটো ভেসে আছে সমগ্র মুখের ওপর; টলটলে, সদ্য মোড়ক খোলা পুরো একটা শরীর! হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঝুমি তার অতীত থেকে উঠে এসেছে। চমৎকার, প্রবল এক ঝুমি!

'তোমার কি ভাল লাগছে ছবিটা?' দাম মিটিয়ে জবাবের গলায় প্রশ্ন করল শ্যামল, 'দেখবে?'

খাতাটা বুকের কাছে ধরে কাউণ্টারে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল ঝুমি। জবাব দিল না।

'বরং বেরিয়ে পড়ি।' শ্যামল ঘড়ি দেখল, 'মাত্র সওয়া সাতটা—'

আঁচলে কাঁধ পিঠ ঢেকে ঝুমি শ্যামলের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল।

এই সময় সাধারণত রাস্তা ফাঁকা থাকে না। তবু ফাঁকা। মেয়ো রোড ধরে পার্ক স্ট্রীট এবং উল্টো দিকে কিছু গাড়ি যাতায়াত করছে। সামনে পড়ে আছে অতিকায় চৌরঙ্গির রাস্তা—শ্যামল ট্রাম বা বাস দেখতে পেল না। ফুটপাথে, আর্কেডের নিচে বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ। পাঁচ মিনিট পথ পেরুতে মাত্র বিক্ষিপ্ত দু'জনের সঙ্গে দেখা হল।

পাশে ঝুমি। একটু বা মন্থর হাঁটার ভঙ্গি। ওপরে তাকালে পরিচ্ছন্ন আকাশ চোখে পড়ে, মিহি জ্যোৎস্না গাছ মাঠ ছাড়িয়ে চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। গ্র্যাণ্ড হোটেলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই চোখ জ্বালা করে উঠল।

ছোট জটলায় চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে। থমথমে মুখ। ওপাশে পুলিশ-ট্রাক ঘিরে কয়েকজন পুলিশ। রাস্তা ভর্তি ইঁটের টুকরো, একজন পুলিশ সেগুলো কুড়িয়ে রাস্তার ধারে ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটা ডবলডেকারকে মেয়ো রোড ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটে যেতে দেখল।

জটলাব কাছ বরাবর এসে শ্যামল দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের রুমালে অনবরত চোখ রগড়াচ্ছে ঝুমি। শ্যামল অনুমান করল এইখানে টিয়ার-গ্যাসিং হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করতে একজন সেই কথা বলল। ভিয়েতনামে মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে ছাত্রদের মিছিল বেরিয়েছিল, সেই থেকে গোলমাল। খানিক আগেই টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়েছে। যে বলছিল সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোথায় যাবেন?' বলে জুলজুলে চোখে ঝুমির দিকে তাকাল। শ্যামল দেখল অসাবধানে ঝুমির বুক থেকে আঁচল সরে গেছে। ট্রাম বাস বন্ধ কি না জিজ্ঞেস করে ও ঝুমির হাত ধরে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল।

এদিকটা স্বাভাবিক। তৎপরতা একটু কম হলেও স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা। চোখে জ্বালাধরা ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। কর্পোরেশনের সামনে দিয়ে একটা বাস এগুতে দেখে শ্যামল বুঝল অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

ঝুমি হাসল অপ্রস্তুতভাবে।

'এখন কি হবে?'

'কি আর হবে! কলকাতায় এটা রোজকার ব্যাপার—'

ঝুমি বলল, 'আমাদের কলেজে কাল ইলেকশন...'

খালি ট্যাক্সি দেখে শ্যামল চেঁচাল। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সিটা।

'কোথায় ?'

'চল, আমার ওখানে—'

'না। দেরি হয়ে যাবে।'

ঝুমির গলায় অনুৎসাহ নেই। কথাগুলো আলতো, প্রায়ই অস্ফুট। বিয়ের পর দিন সকালে বৌদি এইরকম গলায় কথা বলেছিল।

'ছবিটা পুরো দেখলে সাড়ে ন'টার আগে ফিরতে না।' শ্যামল ওর হাত ধরে টানল, 'তাছাড়া, তুমি এখন সুনন্দাদের বাড়িতে—'

ট্যাক্সিতে উঠে ঝুমি বলল, 'মেসের লোকগুলো কেমন করে তাকায়—'

শ্যামল কাছে টানতে কাটা ডালের মতো ঝুমির মাথাটা ওর কাঁধে নেতিয়ে পড়ল।

'বাড়িতে থাকতে আজকাল আর ভাল লাগে না।'

'জানি।'

'কি ?' খাতাটা কোল থেকে খসে পড়েছিল, তোলবার জন্য সামান্য ব্যগ্র হল না ঝুমি। আঙুলে আঙুলে আবার সেই মেশিনের প্যাঁচ।

শ্যামলের নিঃশ্বাস তপ্ত। কিছু বলতে গিয়ে আবার নৈঃশব্দ্যে ফিরে গেল।

এখনই সময়। ঝুমি ভাবল, বলার কথাগুলো এখনই বলে ফেলতে হবে। উত্তেজনায় বুকের ভিতর কলকব্জাগুলো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, জামা কাপড়ের নিচে কুলকুল করে ঘেমে যাচ্ছে

সমস্ত শরীর। কিভাবে কথাটা শুরু করবে ঝুমি বুঝতে পারল না, প্রতিটি মুহূর্ত তার শিরার ভিতর ঢুকে রক্তের ফিন্‌কির মতো ছুটতে লাগল।

ট্রাফিকে গাড়ি দাঁড়াতে সরে বসল ও। অকারণেই ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। শ্যামলের চোখ বাইরের দিকে। শ্যামল, দাদার বন্ধু। মানেটা এইরকম, দাদার মৃত্যু এই কাছাকাছি আসার সুযোগটা করে দিল। হয়তো এইরকমই হয়।

ঝুমি একরকম বিষণ্ণতা বোধ করছিল। দাদাকে জড়িয়ে কিছু ভাবতে ভাল লাগল না। গতির নিস্তব্ধতায় শ্যামলের ঘন সান্নিধ্যে বিভোর হতে হতে হঠাৎ দাদার অসুখটার কথা মনে পড়ল। মৃত্যুর আগে ক'টা দিন খুব শান্ত দেখাত দাদাকে; বিকারহীন, যেন তাদের সম্পর্ক থেকে দূরে এলোমেলো একটা ভাবনায় ডুবে থাকত সারাক্ষণ। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে দাদাকে নয়, দাদার শরীরের ভিতর রক্তকণিকাগুলো চোখে পড়ত যেন। লাল থেকে সাদা, লাল থেকে সাদা হতে হতে একদিন শেষ হয়ে গেল! হয়তো এইরকমই হয়।

কী-বোর্ড থেকে চাবি তুলে দারোয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল শ্যামল। আগের দিন নিচে, বারান্দায়, চেয়ার পেতে কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখেছিল। আজ কেউ নেই। কপাল ভাল, আজ কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে ভারী, অসহায় শরীর টেনে উঠতে উঠতে নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হয়। বলার কথাগুলো গুরগুর করে পেটের মধ্যে। মনে পড়ে বসুধার মুখ। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্যামল ছাড়া আর কারও মুখ সে দেখে নি। সে কি শ্যামলের ওপর নির্ভর করতে পারবে?

দরজা খুলে শ্যামল লাইট জ্বাললো, পাখার স্যুইচটা অন্ করে দিল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'তোমাকে' একটা

জিনিস দেবো।'

'কি?'

'দেখো—'

শ্যামলের মুখে একটা গন্ধ পেল ঝুমি। খানিক আগে, ট্যাক্সিতে আসতে আসতে, এই গন্ধটা সে নিজের শরীরেও টের পেয়েছিল। গন্ধটা বিশ্লেষণ করা যায় না। চেয়ারটা বাদ দিয়ে ও বিছানায় গিয়ে বসল।

আলনা থেকে পায়জামা তুলে নিয়ে বেরুতে বেরুতে শ্যামল বলল, 'বসো, বাথরুম থেকে আসছি।'

'ফিরতে হবে—'

'তাড়া কিসের!' বিচ্ছিন্নভাবে হাসল শ্যামল, 'আমি পৌঁছে দেবো—'

দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে গেল শ্যামল।

জানলাগুলো বন্ধ। ঝুমি খুলে দেবার কথা ভাবল, উঠতে পারল না। এই মুহূর্তে শ্যামলের থেকে দূরত্বে থেকেও সে তার শরীরে পরিষ্কার জ্বর আসা টের পেল। আলতো হাতে বালিশটা টেনে নিয়ে নাকের সামনে ধরল; সেই অপরিচিত গন্ধটা আবার ফিরে আসছে। কাছেই কোথাও রেডিওতে খবর চলছে, উৎকর্ণ থেকে শব্দগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করল ও। আর-সব শব্দের মধ্যে হিজিবিজি একটা শব্দ কানের পর্দায় গুঞ্জন করছে। সম্ভবত পাখার শব্দ, সম্ভবত অবসাদের, সম্ভবত সময়হীনতার। শরীরটাকে বিছানার ওপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল ঝুমি। ক্লান্তি কি না ঠিক অনুভব করা যায় না। ভাল হত যদি আলোটা নিবিয়ে দিত কেউ।

গায়ের ওপর নরম একটা ভার পড়তে ও চোখ খুলল। শ্যামল বলল, 'পছন্দ হয়েছে?'

শূন্য চোখে শ্যামলকে দেখল ঝুমি। তারপর বুকের ওপর থেকে

পরিষ্কার পাট-করা সিল্কের শাড়িটা তুলে নিল হাতে। উঠতে যাচ্ছিল, পাশে বসে কাঁধ দুটো ধরে নামিয়ে দিল শ্যামল। এক মুহূর্তে শরীরটা হিম. হয়ে এল যেন। কোনরকমে ঘাড় তুলে ও দরজার দিকে তাকাল। খিল বন্ধ।

'আমি এবার যাব—'

স্বরটা পরিষ্কার হল না। শরীরের দু'পাশে থামের মতো শ্যামলের দু'টি রোমশ হাত। গেঞ্জি পরার দরুন হাত ও কাঁধের পেশিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর মুখের মধ্যে চোখ দুটো বড় বেশি প্রকট। কপালে নিঃশ্বাস লাগতে দাঁতে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ঝুমি।

'কিছু বললে না তো ?' শ্যামল বলল ; বলতে বলতে ভাঁজ-করা শাড়িটা ওর বুক থেকে নামিয়ে পাশে রাখল।

শাড়িটার দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট টের পেল ঝুমি, তার সমস্ত শরীর জুড়ে কান্নার বেগ আসছে। আর তখন, তীব্র অসহায়তার মধ্যে ও দেখল, শ্যামল বেড-স্যুইচটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

'শ্যামলদা, প্লীজ—'

গন্ধটা পুরোপুরি তরল হয়ে নেমে গেল মুখের মধ্যে। যাবতীয় শব্দ এখন অসাড়। অন্ধকারে বিদ্যুচ্চমকের মতো অসংখ্য আগুনের শিকড় নানা দিক থেকে ঢুকে পড়ছে শরীরে। সেই ডুবে যাওয়ার অনুভূতি, হাতে পায়ে পাথর বেঁধে ক্রমশ জলের নিচে তলিয়ে যাওয়া। তারতম্যহীন অন্ধকারে আশ্লিষ্ট হতে হতে নিঃশব্দ কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল ঝুমি।

১।

লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে আরো কিছু দূর এসে বসুধা বললেন, 'তুমি এবার যাও নিখিল। আমি ফিরে যেতে পারব।'

কথা হচ্ছিল গলির মুখে দাঁড়িয়ে। ছিট-কাপড় আর মুদির দোকান পেরিয়ে অমিয়র বাড়িটা এখান থেকেই দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, 'ঠিক পারবেন তো? না আমি অপেক্ষা করব?'

'পারব, পারব।' দ্রুত কথা বললেন বসুধা, 'এ-পাড়ার নাড়ি-নক্ষত্র সবই যে চিনি! গোড়ায় একটু খটকা লেগেছিল, তাই বাড়িটা চিনে নিলুম। বয়স হয়েছে, ঠিকানা মিলিয়ে খুঁজে বের করা কি আমার কাজ!'

নিখিল তবু ভরসা পেল না। এমনিতে বসুধাকে বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। কিন্তু এই ভর-দুপুরে, অসময়ে, যখন অমিয় বাড়ি নেই, রেখার সঙ্গে কি এমন দরকার পড়বে বসুধার! অমিয় থাকতে থাকতে এলেই ভাল হত, খুশি হত অমিয়—তাকেও অফিস পালিয়ে বসুধাকে সঙ্গ দিতে হত না!

এই একটা জায়গায় সরল, স্নেহপ্রবণ, মমতাময়ী বসুধা কেমন যেন অস্পষ্ট। এখন মনে হচ্ছে এই রহস্য থেকে বসুধাকে দূরে রাখতে পারলেই ভাল হত।

নিজের শক্তিহীনতা, অক্ষমতা, মাঝে মাঝে মনের ওপর বড্ড বেশি চাপ দেয়। মাঝে মাঝে মনে হয় এইসব থেকে নিজেকে দূরে

সরিয়ে নিতে পারলেই ভাল হত। শেষ পর্যন্ত এরা তার কে! কেউ নয়। সম্পর্ক যার সঙ্গে ছিল তাকে মেঘ, হাওয়া, সময়ের মতো চিরজাগতিক ও অস্পৃশ্য মনে হয়। অথচ, নিঃসম্পর্কীয় এই মানুষগুলোর সঙ্গে তার দিনযাপন এমনভাবে জড়িয়ে গেল কেন! অমিয় বা শ্যামলের মতো সে কেন পারল না দূরে থাকতে!

সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল নিখিল। পুরনো কথার জের টেনে বসুধা বললেন, 'তুমি যাও এবার। আমার জন্যে ভেবো না।'

আরো একটু দাঁড়াল নিখিল। আরো একটু ভাবল। তারপর মাথা হেঁট করে ফেরার জন্য পা বাড়াল।

যতক্ষণ নিখিল ছিল ওকে এড়িয়ে যাওয়ার জেদটাই ছিল প্রবল। এতক্ষণে একটু দ্বিধায় পড়লেন বসুধা, এইভাবে একা একা যাওয়া কি ঠিক হবে! বা, সত্যিই এই যাওয়ার কি কোন প্রয়োজন ছিল! রেখা তাঁর কথা বুঝতে পারবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি ভুল বোঝে, যদি অপমান করে! যদি এমন হয়, 'অমিয় ব্যাপারটা জানল, অমিয়র মুখ থেকে আরো পাঁচজন—কোথায় দাঁড়াবেন তিনি!

যুক্তি বসুধাকে চিন্তায় ফেলল, একটু বা আলোড়িত করল। কিন্তু, মনের বিকারটাই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। কি আর হবে, ভাবলেন, উচিত অনুচিত তাঁর মনের মধ্যে। নিজে মেয়েমানুষ হয়ে রেখা কি এই সামান্যটুকু বুঝবে না!

অমিয়র দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল টেপার পরও বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। সারা পথের উত্তেজনা এতক্ষণে বেতাল হয়ে উঠল বুকের মধ্যে। কেমন এক দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ—অস্থিগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে জায়গা বদল করে নিচ্ছে।

দরজা খোলার আগে জানলাটা খুলল। বসুধা রেখাকে দেখলেন। সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে এল।

'চিনতে পার, মা?'

'ও!'

একটু সময় লাগল রেখার। বিস্ময় কেটে যেতে ফ্যাকাশে মুখে কথা ফুটল। তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলল রেখা।

'কতদিন ভেবেছি তোমাকে দেখতে আসব—'

পেটের ভারে ঝুঁকতে অসুবিধে হয়। তবু কোনরকমে ঝুঁকে বসুধার পায়ের পাতা ছোঁবার চেষ্টা করল রেখা। বসুধা ওর হাতটা ধরে ফেললেন।

'অমিয় নেই ?'

রেখার বিস্ময় যাচ্ছে না। আড়ষ্ট, একটু বা ভীত। দরজায় ছিটকিনি তুলে, মোড়াটা টেনে বসুধার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এখন তো অফিসে। আপনি আসবেন জানলে থাকতে বলতাম।'

'জানিয়ে আসবার সময় কোথায় মা!' মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেখাকে লক্ষ করতে করতে বসুধা বললেন, 'এমনিতেই আধমরা হয়ে আছি। যার যাবার নয় সে-ই চলে গেল—সংসার আর ভাল লাগে না!'

বসুধার গলার স্বর আর্দ্র। দেয়ালে রেখাদের বিয়ের ছবি। সেদিকে তাকিয়ে ভারী আঁচলের খুঁটটা তুলে নিলেন হাতে।

'এসো, কাছে এসে বসো—'

রেখা একটা ধাক্কা খেল। এতদিন ধরে ছায়াটাকে প্রাণপণে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কে জানত এমনভাবে সে ফিরে আসবে! শরীরময় স্পষ্টই সে কম্পন অনুভব করল। বসুধার চোখে চোখ রাখা যাচ্ছে না—ভাল হত যদি যে-কোন ছুতোয় একটু আড়ালে যেতে পারত।

সেই ভেবেই বলল, 'দুপুরে এলেন, আপনাকে একটু সরবত করে দিই—'

'না, না।' আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বসুধা বললেন, 'তোমাকে অসুবিধেয় ফেলতে চাই না, মা। কাউকে না জানিয়ে এসেছি, এখুনি আবার চলে যাব।'

বুকের ভিতর এলোপাথাড়ি শব্দ। নিঃশ্বাস সহজ করতে দম নিলেন বসুধা।

'কাছে এসো একটু। তোমার হাতটা ধরি।'

রেখার নড়ার অপেক্ষা না করেই হঠাৎ ওর হাতটা টেনে মুঠোর ভিতর সোনার ছোট সিঁদুর কৌটোটা তুলে দিলেন বসুধা।

'ওর বউকে দেবো বলে তুলে রেখেছিলাম। তুমি এটা ব্যবহার করো, মা ; আমার আশীর্বাদ আছে। আর কেউ জানতে পারবে না—'

বসুধার গলা বুঁজে এল। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'ও তোমায় বড় ভালবাসত। আমি মা, আমি সব বুঝতে পারি।'

নিরক্ত মুখে কিছুক্ষণ থ হয়ে বসুধার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রেখা। ক' মুহূর্ত। তারপরেই বসুধার জানুতে মাথা রেখে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আঁচলে চোখ মুছে হাসলেন বসুধা। রেখার মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এ-সময় উত্তেজনা ভাল নয়, রেখা। কেঁদো না। তোমার বিরুদ্ধে কি কোন অভিযোগ নিয়ে এসেছি! কাঁটার মতো বুকে বিঁধেছিল এতদিন, এখন বড় হাল্‌কা লাগছে—'

বসুধা চলে যাবার পরও একভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রেখা। হাতের মুঠোয় সিঁদুরের কৌটো, হাতের মুঠোয় সময়টা ধরা। খোলা দরজা পেরিয়ে সামনে পড়ে থাকে ফাঁকা রাস্তা।

একটা এঞ্জিন শান্টিং করে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে, সেই শব্দ ; দিকভ্রষ্টের মতো এঞ্জিনটা কোনদিকেই এগোয় না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অনুভব করল মুঠোভর্তি ধাতুর অবিচ্ছিন্ন উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে—ধীরে ধীরে, কিন্তু প্রবল-ভাবে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে রক্তে। এইভাবে থাকলে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। এতদিন পর্যন্ত কোনরকমে যাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল যুক্তি, বোধ আর সহ্যশক্তি দিয়ে, এতদিনের সমস্ত প্রতিক্রিয়া নিয়ে এই মুহূর্তে সে সামনে এসে দাঁড়াল। রেখার কাছে তার অনেক দাবী। না, রেখা তাকে ফেরাবে না। নিজেও ফিরবে না। এই সন্দেহ, ক্লিন্নতা আর অসহায় অভিমানের ভার নিয়ে বার বার আর সে জেগে উঠবে না।

আস্তে দরজাটা টেনে দিল রেখা। রোদ্দুরে ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে বিকেল। রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত পারাপার করল শীত ; ফিউজ বাল্‌বের ভিতরের বিচ্ছিন্ন তারের মতো কিছু একটা দুলতে থাকল বুকের ভিতর। আকাশের দিকে দীর্ঘ ও ধারালো শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে এঞ্জিনটা চলে যাবার পরও তার একটানা অনুরণন জের টেনে চলেছে মাথায়। রেখা হাঁটছে। সামনের কোন-এক দিনে ভূমিষ্ঠ হবে তার গর্ভজাত সন্তান, প্রায় অমিয়র মুখের আদল—তার ভারে নুয়ে পড়ছে পেট! এই মুহূর্তে তার চারপাশে কার্ফুর মতো অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর-কিছু নেই। পুরনো হলেও, জানে, কবেকার স্মৃতির রাস্তা ধরে এখন সে হেঁটে যেতে পারবে পৃথিবীর শেষ ও নির্জনতম জায়গায়। ক্লান্তিই টেনে নিয়ে যাবে তাকে। তারপর সিঁড়ি ধরে কয়েক পা ওপরে ওঠা, ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকাবে নিচে, জলের দিকে। মরে যাওয়া কি আর এমন শক্ত!

ভাবনা অমিয়কে নিয়ে। অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে

অসুবিধে হবে না অমিয়র, বাড়তি চাবিটা সব সময়েই তার কাছে থাকে। না, সে-জন্য নয়। বাড়ি ফিরে যখন দেখবে রেখা নেই, রেখা আসছে না, রেখা আর এল না—চেনাশোনা সমস্ত ঠিকানা থেকেই ফিরে আসবে ব্যর্থ হয়ে, কি ভাববে তখন অমিয়! রেখার মৃত্যুর জন্যে সে কি নিজেকেই দায়ী করবে! তার অজাত সন্তানের অভাবে ভেঙে পড়বে আস্তে আস্তে! অমিয় কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে?

না। সমস্ত শরীর বেজে ওঠে ঝন্‌ঝন্‌ করে; দপ্‌ করে কোথাও একটা আলো জ্বলে উঠেই হারিয়ে যায় আবার। অনেক দূর থেকে উল্টোমুখে অমিয়কে হাঁটতে দেখল রেখা—নিশি-পাওয়া মানুষের মতো সেই হাঁটা। বহুদূর থেকে ভেসে এল একলা কুকুরের কান্না। ইদানীং এইসব নিয়েই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল অমিয়, কেমন এক উদাসীন মায়ায় নিজেকে ভরে রাখত সারাক্ষণ। মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে কুকুর তাড়াতো, দুধের বাটির শেষ চুমুকটুকু ছুঁড়ে দিত গৃহস্থ বিড়ালের দিকে। একেকদিন গভীর রাতে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানত চুপচাপ। ইস্পাতের লাইনের ওপর দিয়ে চুপিসাড়ে গড়িয়ে যেত মালবাহী রাতের ট্রেন। শব্দ থেকে অন্ধকারে যেতে যেতে অশুভ ভাবনায় কেঁপে উঠত বুক—নিজেকে জাগিয়ে রেখে এইভাবে কাকে তুমি পাহারা দিচ্ছ, অমিয়! আমাকে? যে আসছে, তাকে?

আচ্ছন্নতার ঘোরে একটার পর একটা বাঁক পেরিয়ে এল রেখা। চতুর্দিক থেকে ছায়ার পর ছায়া এসে আড়াল করে দিচ্ছে অমিয়কে। পরিবর্তে ভেসে উঠছে আর একটি মুখ। নীরক্ত, রুগ্ন, গলা মোমের মতো সেই মুখের ভিতর একমাত্র চোখ দুটোই স্পষ্ট; রেখার কাছে তার অনেক দাবী। কেন! এই পৃথিবীর অপর্যাপ্ত সম্ভাবনার

মধ্যে থেকে কেন টেনে নিয়ে যেতে চাইছ আমাকে! নিরুত্তর বুকে ব্রীজের ওপর থেকে ঝুঁকে নিচে তাকাল রেখা। জলে জল এসে মিশে যাচ্ছে পর পর, দিনশেষের কাল্‌চে আভায় চোখে পড়ছে গভীর থেকে উঠে আসা মাছের ঝাঁক, নিস্তব্ধ লেক, শুধু অনেক দূর দিয়ে একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে মনে হল। এখনই সময়, রেখা ভাবল, ঝপ্‌ করে শব্দ 'হবে একটু, আর যতক্ষণে কেউ টের পাবে, ততক্ষণে সে নেমে যাচ্ছে নিচে—তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গভীর কালো জল আর মাছের ঝাঁক, শ্যাওলা আর জলজ তৃণের গন্ধে শান্ত হয়ে আসছে নিঃশ্বাস, বিস্বাদ হাঁ-য়ের ভিতর আসা যাওয়া করছে জলের পোকা!

পরিপূর্ণ মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে এইভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিল রেখা। হাতের মুঠো আল্‌গা করতে গিয়ে অতর্কিতে মনে হল, অমিয়র কোন ক্ষতি হবে না তো! স্পষ্ট অনুভব করল তার পেটের ভিতর ছুটো আবদ্ধ হাতের মুঠি খুলে যাচ্ছে; রক্ত মাংস রোমকূপ ফুঁড়ে সিরসির করে উঠছে চীৎকার। না, এভাবে সে নিজেকে নিঃশেষ করতে পারবে না। শিশুর হাতের স্পর্শের মতো আলো হাওয়া এসে ছেঁকে ধরছে তাকে। বেঁচে-থাকার প্রতি প্রগাঢ় মমতায় আস্তে আস্তে বসে পড়ে রেখা, আস্তে আস্তে গড়িয়ে দেয় চোখের জল। আর অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করে, ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।

১১

আজও কোন কাজ হল না। মুখুজ্জ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শুধু এইটুকু বুঝল তার দরখাস্ত রেকমেণ্ড করে পাঠানো হয়েছে। জবাব আসতে দু' চারদিন দেরি হবে।

তার মানে আরো কিছুদিন অপেক্ষা। আরো কিছুদিন উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকা।

এইভাবেই দেখতে দেখতে চারটে মাস চলে গেল! অপেক্ষার শেষেও যে কাজটা হয়ে যাবে—চাকরিটা পাবে সে, সে-রকম নিশ্চয়তা নেই। মুখুজ্জ্যে কি কোন আশ্বাস দিচ্ছেন?

সোজাসুজি প্রশ্নটা করে ফেলল বুলা। ভিতর থেকে আজকাল একটু জোর পাচ্ছে, কথাবার্তা বলতে আঁটকায় না। নিজের স্পষ্টতায় বা সাহস দেখে মাঝে মাঝে নিজেই রীতিমতো অবাক হয়ে যায়।

'আশা করতে দোষ কি! মানে—', চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলল মুখুজ্জ্যে, 'ব্যাপারটা ঠিক আমার হাতে নেই। তবে, আপনার দাদা চাকরি করতেন এখানে, ইউনিয়ন সাপোর্ট করছে আপনার কেস্, মানে—'

বুলা বুঝল মুখুজ্জ্যে বিব্রত বোধ করছে। আসলে এর বেশি কিছু তার বলার নেই। এমনও হতে পারে, শুধু অক্ষমই নয়, তার ব্যাপারে বিশেষ খোঁজ খবরও মুখুজ্জ্যে রাখে না।

'আপনাকে বিরক্ত করলাম।' চটিটা পায়ে টেনে উঠে দাঁড়িয়ে

বুলা বলল, 'চলি তাহলে আজ—'

'কেন! টী বললুম যে!' নাক দিয়ে গলগলে ধোঁয়া বের করে সামনে ঝুঁকে এল মুখুজ্জ্যে, 'আমার টাইমের জন্য ব্যস্ত হবেন না, মানে—চা খাবেন না! এমনি গল্পগুজবও করতে পারি আমরা। আর ইউ সিওর—এখনই চলে যাবেন?'

অল্প হাসল বুলা।

'ধন্যবাদ।'

তিন তলার ওপর থেকে নিচে রাস্তা দেখা যায়। সেখানে বহু মানুষের ভিড়। ফেস্টুন আর পতাকায় ছেয়ে গেছে। নির্বিকার মুখগুলিতে বিকেলের আভা, একটা চাপা চাঞ্চল্য। ডেপুটেশন আছে বলেই আজ নৃসিংহকে ধরা যায়'নি। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে পড়বে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিচের ভিড়টাকে লক্ষ করল বুলা। তারপর খুব গতানুগতিকভাবে ভাল্‌কান স্মিথ্ লিমিটেডের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নিচে।

ওপর থেকে যা মনে হয়েছিল জটলা তার চেয়ে আরো অনেক বড়। দূরে কাছে দু'দিকের রাস্তায় সে আরো কয়েকটা জমায়েত দেখতে পেল। আজ হয়তো বড় কিছু হবে।

তাড়াতাড়ি পা চালালো বুলা। পাঁচটা নাগাদ মেট্রোর নিচে নিখিলের অপেক্ষা করার কথা। এইভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেও সে ঠিক পৌঁছে যাবে। নাকি ট্রামে যাবে? কোনরকম ব্যস্ততা না থাকা সত্ত্বেও চৌরঙ্গিগামী একটা ট্রামের ভিড়ে শরীরটা সেঁধিয়ে দিল সে। একা, বড় একা লাগছে। ট্রামের গতি এবং মিছিলের চীৎকারে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল নিজেকে।

খুব হতাশ হল না বুলা। গোড়ার চেয়ে এখন সে অনেক বেশি শক্ত। দুঃখটা সয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল কেমন

একটা নির্ভরতা পায় মনে। কিংবা, দুঃখের মধ্যেই থাকতে ভাল লাগে! নিজেকে কেমন বয়স্ক মনে হয়। শোক, সুখ, এ-সবের বাইরে জীবনযাপনের একটা আলাদা ছক আছে, অদৃশ্য নিয়ামকের হাত মাঝে মাঝে গুটিগুলো ওলট পালট করে দিচ্ছে—এই ছকের মধ্যে সে কোথায় ঠিক বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না কার শোক বেশি, কার দুঃখ, কে কতটা অসহায়! সকলে কি সমান অসহায়! মনে তো হয় না। কিংবা, এমনও হতে পারে, সে ঠিক বুঝতে পারে না। দাশরথি কি বসুধা কি ঝুমি কি অলোকের মুখের দিকে আলাদা আলাদা ভাবে তাকালে মনে হয় না প্রত্যেকের সমস্যা এক, প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঘিরে বাঁচতে চাইছে। সবাই আলাদা, ভীষণরকম আলাদা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, অবিন্যস্ত। চুপচাপ থাকার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। এর মধ্যে সে কোন্ ভূমিকা নেবে!

নিখিল বলে, ভেবো না। একটা কিছু হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিভাবে, কোন্ দিকে, কিসের ওপর অবলম্বন করে, এ-সব কিছুই ওর মাথায় নেই। শুধু শূন্যতাকে নির্ভর করে এগিয়ে চলা—কেউ পারে না কি! নিখিলদা সবই বোঝে। বোঝে না সময় বড় অল্প, সময় থেমে থাকছে না। যা পাবার তার জন্যে অপেক্ষায় থাকলে তাদের চলবে না।

ট্রামটা কি থেমে গেছে! যাত্রীদের অনেককেই নেমে পড়তে দেখে বুলার খেয়াল হল জ্যামের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাম। হাতে ফেস্টুন নিয়ে চারিদিক থেকে মিছিলকারীরা এগিয়ে আসছে। আর এগুনো যাবে না।

বুলা নেমে পড়ল। মিছিলের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডের ট্রাম গুমটিতে পৌঁছে গেল। দূরে বড় বাড়ির ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে। ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে সারি সারি।

মিছিলের নানারকম ধ্বনি একটা ভোঁতা শব্দের সৃষ্টি করছে মাথার মধ্যে। বড় রাস্তায় এসে ও কিছুক্ষণ মিছিলটা পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল। না, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। সাত-পাঁচ ভেবে বুলা মিছিলের মধ্যে দিয়েই রাস্তা পেরুনো ঠিক করল।

দাঁড়িয়ে-পড়া গাড়ির ফাঁক দিয়ে প্রথমবার পা পা করে এগিয়েও ফিরে এল। এগিয়ে যাবার ব্যস্ততায় লোকগুলো ছুটছে, মনে হল তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। আর একটু অপেক্ষা করে ও দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল। বুকের কাছে হাত ছুটো জড়ো করে চোখে অনুনয় এনে ও ছ'জনকে পেরিয়ে দেখল ছ'পাশ দিয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেছে মিছিলটা। ওদিকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাততালি দিল নিখিল। বুলার অস্বস্তি লাগল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চলমান লোকগুলির গায়ের ওপর দিয়েই ও রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠে এল।

সহাস্য মুখে নিখিল বলল, 'বাঃ! তুমি তো বেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছ দেখছি!'

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বুলা বলল, 'চিরকাল কি একরকম থাকব, নিখিলদা?'

'তা বটে।' নিখিল বলল, 'খবর কি? হল কিছু?'

'না—'

নিখিলের পাশে দাঁড়িয়ে বুলা খানিক মিছিলটা লক্ষ করল। পিছন দিকের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, রাস্তা জুড়ে জ্যাম।

বুলা বলল, 'শুধু ঘোরাঘুরিই সার!'

আস্তে ওর পিঠে হাত রেখে নিখিল এগিয়ে গেল। বুলা কাছে আসতে বলল, 'মুষড়ে পড়ছ কেন! আজ আমি ফোনে

কথা বলেছি নৃসিংহ, সুদেবদের সঙ্গে। ওরা চেষ্টা করছে।'

বুলা চুপ করে থাকল। সেই পুরনো কথা—চেষ্টা চলছে, হচ্ছে, হয়ে যাবে। এ-সব শুনতে আর ভাল লাগে না, প্রতিটি আশ্বাসকেই কেমন সন্দেহ হয় আজকাল। নিখিলকে কি বলা যাবে, এই কথাগুলোও আমার কাছে নতুন ভার! আমি আর পারছি না!

বুলা চুপ করে থাকল।

সম্ভবত দূরে কোন নতুন মিছিল আসছে, স্লোগানের শব্দ কানের পর্দায় গম গম করে উঠল। জ্যাম নড়বে না জেনেও ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি আর মোটরগুলো। বিপুল শব্দময়তার আঘাত সহ্য করতে করতে ক্লান্তিতে মূক হয়ে গেল বুলা। এমন কি, নিখিলের সঙ্গও এখন তার কাছে ক্লান্তিকর লাগছিল।

রেস্টুরেন্টের দোতলায় উঠে রাস্তামুখো হয়ে বসল ওরা। নিখিল খাবারের অর্ডার দিল। সেই একই নিয়মানুবর্তিতা—ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। নিখিলের সঙ্গে দেখা হওয়া—নিখিল চা-খাবারের অর্ডার দেবে, পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে গিলতে গিলতে আর একটি দিনের কথা ভাববে সে। নিখিল কি করুণা করে তাকে? তাদের? হয়তো। কি দরকার তাকে দিনের পর দিন নিজেদের সমস্যায় জড়ানোর!

বুলা ক্রমশ মুহ্যমান হয়ে পড়ছিল। যত দিন যাচ্ছে, ভবিষ্যতের দিনগুলো যতই সুদূর হয়ে উঠছে, ততই বেশি করে মনে পড়ছে দাদাকে। রক্তমাংসের মানুষটিকে আজকাল আর তেমন করে মনে পড়ে না। দাদা এখন একটা ধারণা মাত্র—সকলের সবরকম স্বপ্ন আত্মসাৎ করে যে অতর্কিতে চলে গেছে। সেই ধারণার গলায় প্রতি বুধ আর শনিবার মালা পরাতে পরাতে একটা আক্রোশ ফুঁসে ওঠে বুকের মধ্যে—আমরা কি করেছিলাম! অসহায়তা ছাড়া তখন আর কিছু থাকে না।

নিজের ভাবনার মধ্যে ক্রমশ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল বুলা। সে কি খুব স্বার্থপর হয়ে পড়ছে! না হলে আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশ এত নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে কেন! দাশরথি, বসুধা, ঝুমি—সকলকেই ক্রমশ অসহ্য মনে হচ্ছে কেন! কেন ওদের শোক-সুখ-দুঃখ-সমস্যায় কাতর চাপা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কোন জ্বালা, কোন সহানুভূতি টের পায় না সে! কাল রাতে, মনে পড়ে গেল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে ঝুমি কাঁদছে মনে হয়েছিল, হয়তো কাছে টেনে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তার। ঝুমু, ঠকে গেলি নাকি? পরিবর্তে সে কেন চুপচাপ গুটিয়ে নিল নিজেকে!

নিজের মনে এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর পেল না বুলা। শুধু ভাবল, যেন চতুর্দিকের ব্যস্ত সরব কোলাহলের ভিতর একাকী ভাবনাগুলো নিয়ে অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে।

চা, খাবার সমস্ত ঠাণ্ডা হচ্ছিল। নিখিলের ডাকে বর্তমানে ফিরে এল বুলা।

'নিখিলদা, দাদাকে আজকাল মনে পড়ে আপনার?'

আচমকা প্রশ্নে নিখিল একটু অপ্রস্তুত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কেন বল তো?'

'না, হঠাৎ মনে হল—'

প্লেট থেকে কাঁটাটা তুলে নিল বুলা। তারপর হঠাৎই বাষ্পাচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আজ কিছু খাব না। ভাল লাগছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না নিখিল। বুলার চোখ রাস্তার দিকে, একটু বা ভেজা, অন্যমনস্ক। মিছিলের স্লোগানে কান পাতা যায় না। খানিক বুলার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ও বলল, 'এক জনের অভাবে সবকিছুর শেষ হয়ে যায় না, বুলা। নতুন করে শুরু করতে হয়। এত ভেঙে পড়ার কি আছে! তুমি সমস্যা থেকে দূরে থাকতে চাও, সেটা সম্ভব নয়। ওর ভেতর দিয়েই এগোতে হবে—'

বুলা নিখিলের কথা শুনল কি শুনল না, হঠাৎ নিখিলের হাতে চাপ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখুন নিখিলদা, বাবা!'

বুলার পাশাপাশি রাস্তার দিকে ঝুঁকে নিখিল দেখল, মিছিলের মধ্যে মিশে অন্যদের সঙ্গে আকাশে মুঠি তুলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন দাশরথি। এতদিনে আরো শীর্ণ হয়েছেন, আরো ন্যুব্জ। কিন্তু এই মুহূর্তে অদৃশ্য কোন শক্তি ওঁর মুখে তীব্র প্রত্যয় এনে দিয়েছে।

ওরা অনেকদূর পর্যন্ত দাশরথির ওপর চোখ রাখল। অনেক দূর পর্যন্ত ওঁর উত্তোলিত হাতটা দেখা গেল। শেষে ধ্বনির রেশটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকল না।